হাদিয়ায়ে দাওয়াত

হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)

খলিফা : মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
পরিচালক : জামিয়াতুল ইসলাম শাহ ওলিউল্লাহ

অনুবাদ
মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক: ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১
www.jubaer ahmad.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর-২০১৪ইং
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি -২০১৪ ইং.

হাদিয়ায়ে দাওয়াত
❖ হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী, **অনুবাদ**, মুফতি যুবায়ের আহমদ
প্রকাশক : আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
❖ **স্বত্ত্ব :** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বই প্রকাশ করতে পারবে
❖ **কম্পোজ :** রেজাউল করীম

প্রাপ্তিস্থান
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
ও মাকতাবাতুল আযহার এবং অন্যান্য লাইব্রেরি

মূল্য : একশত টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে, যারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলামের সু-শীতল হাওয়া পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন– তাদের রূহের মাগফিরাত ও মাকাম বুলন্দে, বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী ও পীর মুরশিদ মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদভী (রহ.)-এর খলীফা, দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুমের নেক হায়াতের প্রত্যাশায় বইটি উৎসর্গ করা হল।

বিনীত

যুবায়ের আহমদ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করো।'

-সূরা আলে ইমরান-১১০

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় 'হাদিয়ায়ে দাওয়াত' বইটি প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোনো আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে দাওয়াতি কাজ করতে উদ্যমী হন এবং সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর দয়ায় ক্ষমা করে দেন। সাথে সাথে দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন!

তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
২০-০২-২০১৪ ইং

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত করার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগে মহিমান্বিত মহামণীষীদের প্রতি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! ২০০৩ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে (ভারত) ভর্তি পরীক্ষা শেষে ইচ্ছে হলো– ফলাফল বের হবার আগে আমাদের বুযুর্গদের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখে আসি। সেই নিয়তেই প্রথমে নির্বাচন করলাম মুজাফফরনগর জেলার খাতুয়াল্লি থানার ফুলাত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামটি। সেখানে রয়েছে শাহ-ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.–এর জন্মভূমি। যেই ঘরে শাহ ওলিউল্লাহ রহ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে ঘরটি এখনও সেভাবে বিদ্যমান। আরো রয়েছে দেখার মতো বহু কিছু।

সেখানে গিয়ে একটি খানকায় অবস্থান কালে একজনের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সাথে কিছু ক্ষণ আলাপ হওয়ায় আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এমন মানুষ ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। যেমন তাঁর নূরানী চেহারা, তেমনি তাঁর সুন্নতের এত্তেবা। তাঁর অন্তরের একরাশ বেদনা এবং হৃদয়ের তপ্তজ্বালা আমাকে ছুঁয়ে গেল। তাঁর চিন্তা-চেতনা আমাকে ভাবাতুর করে তুলল। পরে জানতে পারলাম, তিনি হলেন একজন বড় দা'য়ী মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা, হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী। তাঁর মাধ্যমে এপর্যন্ত লক্ষাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমার খুবই পছন্দ হলো। মনে মনে এমন একজন শায়খকেই সন্ধান করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে মিলিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সাথে এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করলাম এবং যাওয়া-আসাও চলতে থাকলো। সেসময় হযরত বেশ কিছু বই হাদিয়া দেন, তার মধ্যে একটি– হাদিয়ায়ে দাওয়াত। অসাধারণ একটি কিতাব।

হযরতের বাংলাদেশে সফর উপলক্ষে খুবই অল্প সময়ে বইটির অনুবাদ করতে শুরু করি, ভালো প্রূফ দেখারও সময় পাইনি, ফলে প্রচুর পরিমাণ ভুল থেকে যায়। এবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি এবার ভুলের সংখ্যা কম হবে। আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হল হযরতের হাতে বইটি উদ্বোধন করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের জন্য অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। যাঁদের দুই

একজনের নাম না বললেই নয়। তাঁরা হলেন ভাই তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী, এ.কে.এম ফজলুল করিম সাহেব। আমার ছাত্র আবুবকর, ইমরান, রেজাউল। এবং প্রূফ দেখে সহোযোগিতা করেছেন– ইশতিয়াক ভাই, আলী হাসান, এমদাদুল হক তাসনিম। আল্লাহ তা'আলা সকলের এখলাস ও সৎ নিয়তকে কবুল করে, দীনের দা'য়ী হিসেবে কাজ করার তৌফিক দান করুন।

সেই সাথে পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরয, মানুষ হিসেবে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাদের চোখে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে জানালে খুশি হবো এবং তৃতীয় সংস্করণে ঠিক করে নেবো ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে দা'য়ী হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

যুবায়ের আহমদ
১৪/৬/২০১৪

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার নাজেম ও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর খলিফা, হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী দা.বা.-এর

ভূমিকা

কুরআন মাজিদে মুসলিম জাতিকে সর্বোত্তম জাতি বলা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর কথাও আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষদের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনবে।"

আয়াতটি হলো এই–

كنتم خير امة اخرجت للناس.....

এই উম্মতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজ। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই অন্যান্য জাতির উপর মুসলিম জাতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই উম্মতকে অন্যান্য জাতির উপর দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। হাশরের দিন অন্য সকল জাতির আমলের জন্য উম্মতে মুহাম্মদিকে সাক্ষী হওয়ার অধিকার-মর্যাদা দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদি অন্যান্য সকল জাতির ভালো এবং মন্দের মাঝে পার্থক্য করবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ভিত্তিতে এই উম্মত সকল জাতির কোন আমল করা উচিত আর কোনটি অনুচিত এ ব্যাপারে জ্ঞাত হবে। এই জন্য এই উম্মত তাদের আমলের সর্বোত্তম সাক্ষী হবে। কিন্তু আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা এই জাতির বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর প্রভুত্বকে মেনে নেয়। তিনিই ইবাদত ও সিজদা পাওয়ার যোগ্য এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তাঁর হুকুম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটকথা প্রতিটি কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকা অনুযায়ী পরিচালনা করবে। অন্যকে উপদেশ

দেবে আর নিজের ব্যাপারে অমনোযোগী হবে এটা মুসলমানের নীতি নয়।

বরং এই উম্মতের নীতি হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, অন্যদেরও দাওয়াত দেবে। সত্য ও সরল পথে আহবান করবে। আর এটাই এই উম্মতের একক বৈশিষ্ট্য।

এই জাতি নিজের ভালো-মন্দের দিকে খেয়াল করবে, অন্যের ভালো মন্দের ব্যাপারেও চিন্তা ফিকিরকারী জাতি নিজের এ দায়িত্বকে পরিপূর্ণ করবে। আর এই দায়িত্ব পালন করাকেই দাওয়াত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা এই জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দাওয়াত। যা এই জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে অনুগ্রহও করেছেন। যেভাবে দাওয়াত দিলে দাওয়াতের হক আদায় হয়, সে জন্য।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কিছু লোক থাকতে হবে, যারা দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিবে। এমন কিছু লোক থাকলে দায়িত্ব সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেননা কুরআন মাজিদের অন্য এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ولتكن منكم أمة يدعون.....

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে যারা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজের নিষেধ করবে তারাই সফল।" কোরআন মাজিদের অন্য এক স্থানে সফলতার দিকে এভাবে ইঙ্গিত হয়েছে, সেখানে আযাব ও শাস্তির আলোচনায় বলা হয়েছে। যখন শাস্তি আসবে তখন ওই সকল লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে যারা মন্দ কাজ ও আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত ছিলো। ওই সকল লোকদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, যারা অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতো। অন্যরা তো তাদের ব্যাপারে কিছু বলেনি। কিন্তু হাদিস শরীফে এক স্থানে তাদের কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, একবার এক সৈন্যবাহিনী কা'বা শরীফের উপর আক্রমণ করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলে, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ বাহিনীকে জমিনে মিশিয়ে দিলেন। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বাহিনীর মধ্যে তো সৈন্য ছাড়াও আরো অন্য লোক থাকে যারা অন্য কাজ করে। তাদের তো যুদ্ধের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না । ঐ সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ধ্বংস তো সবাইকে করে দেয়া হবে। তবে হাশরের দিন তাদের নিয়ত ও আমালের ভিত্তিতে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে।

মোটকথা যেখানে দাওয়াতের কাজের প্রয়োজন, সেখানে দাওয়াতের কাজ আদায় না করলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি পাকড়াও করা হয়, তাহলে ঐ সকল লোক যারা খারাপ মানুষদের সাথে মেলা-মেশা, উঠা-বসা করে, তাদেরকে তাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না তারাও পাকড়াও হবে। আর শুধুমাত্র তারাই রক্ষা পাবে, যারা মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে। এজন্য দাওয়াতি কাজ এই উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির খুবই প্রয়োজন। বরং দাওয়াত আল্লাহর আযাব ও শাস্তি থেকে মুক্তির মাধ্যম। দাওয়াতি কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর ওলামায়ে কেরাম বই লিখেছেন। এ বিষয়ে তারা বিরামহীন চেষ্টা করেছেন। তাদের এই নেক চেষ্টার বরকতে দুনিয়া আজও পর্যন্ত টিকে আছে এবং কঠিন কোনো আযাব এখনো দুনিয়াকে গ্রাস করেনি। কিন্তু আল্লাহ না করুন এই কাজ যদি স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, অথবা সত্যের অনুসরণকারীর সংখ্যা না থাকে, এই কাজ যদি দুনিয়া থেকে মিটে যায়, তাহলে দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য। এমনিভাবে মানুষের দুনিয়ায় বাকি থাকা এবং কল্যাণের পেছনে দাওয়াত প্রধান ভূমিকা রাখবে। যারা দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব অনুধাবনকারী, দাওয়াতি কর্মী তাদের মধ্যে বর্তমান সময়ের একজন নওজোয়ান মাওলানা কালিম সিদ্দিকীও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুজাফফর নগর জেলার ফুলাত তাঁর বসতভূমি। তাঁর সম্পর্ক হল ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের সাথে। তাঁর এই চেষ্টা– দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসা তৈরি, দাওয়াতি সাক্ষাৎ, দাওয়াতি ইজতেমা, দাওয়াতি বিষয়কে লেখা-লেখি এবং অন্যান্য মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিলো মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (রহ.) এর সাথে। নিজের কাজের ব্যাপারে সর্বদা তিনি মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)- এর থেকে পথ নির্দেশ লাভ করেছেন। হযরত মাওলানা থেকে তিনি খেলাফতও পেয়েছেন। তাঁর মূল ময়দান ছিল হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের মুরতাদদের মাঝে। মুরতাদদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ তাঁর চেষ্টায় ইসলামে ফিরে এসেছে। অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি দাওয়াতের উপর অনেকগুলো

বই রচনা করেছেন। একটি বই মাসিক আরমোগানে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়েছে। এই গ্রন্থটি দাওয়াতি বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। যার মধ্যে তিনি দাওয়াতের গুরুত্ব, কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত দাওয়াতের পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বইটি দা'য়ীদের জন্য খুবই জরুরি মনে করছি। আশাকরি বইটি থেকে পাঠক অনেক উপকৃত হবে। আমি মাওলানা মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী ফুলাতীকে তার এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই। মোবারকবাদ দিই। দু'আ করি আল্লাহর রাস্তায় তাঁর এই প্রচেষ্টা বেশীর থেকে বেশী আল্লাহর দরবারে কবুল হোক এবং পাঠকদের জন্য উপকারী হোক। আমীন!

وما ذلك علي الله بعزيز

মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী
নাজেম, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা
লাখনৌ, ৩রা সফর -১৪২০হিজরী

বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ)এর সম্মানিত মুহতামিম, ক্বারী তৈয়ব সাহেব রহ. এর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ছালিম কাসেমী দা.বা . এর

অভিমত

ইতিহাস এই বাস্তবতার সাক্ষ্য দেয়, ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম। প্রত্যেক যুগে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত দুস্কৃতিকারীরা শুধুমাত্র তার দাওয়াতের শক্তির কাছেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পরাস্ত

হয়েছে। যার মৌলিক ও প্রধান কারণ হলো, ইসলাম পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মসমূহের মতো শক্তি, আলামত, সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা পোষণকারী শুধুমাত্র মনের যুক্তির উপর তাও নয়। বরং ইসলামের মূল কাঠামো আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহির উপর গঠিত। যা সরাসরি মানুষের প্রকৃতির উপর প্রভাব
বিস্তার করে এ জন্য বহিরাগত কোনো শক্তির প্রয়োজন নেই।

তাওহীদ, ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার সত্যতা, বাস্তবতা যাতে অগনিত সৃষ্টজীব আল্লাহর একত্ববাদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। এবং অসংখ্য যোগ্যতা তাঁর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান, শক্তি, শ্রবণ-দেখা-ইচ্ছা করা এবং কথা বলা, ইত্যাদি আবশ্যিক পরিপূর্ণ গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও, তারা অসম্পূর্ণ। তাদের এই দুর্বলতা মহান স্রষ্টার মুখাপেক্ষী করেছে। যিনি সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর মালিক। সকল অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সকল শক্তির মালিকও তিনি। তাঁর এই সাদৃশ্য আবশ্যক এমন মহান সত্ত্বা থেকে ইসলাম মনুষ্যত্বকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সম্মানিত নামের উপর ভিত্তি করে ইজ্জত এবং গৌরব দান করেছেন। তাই দা'ওয়াতের কাজের চাহিদার ক্ষেত্রে নিজেকে সোপর্দ করা। দুনিয়ায় অবস্থিত সকল মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার জন্য সৌভাগ্য যা চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। এমন আল্লাহর কালাম যা সৃষ্টি জীব নয়, একে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরে এর দ্বারা উপকার লাভ করা, আল্লাহর ওলি, কুতুব, গাউছ আবদাল ইত্যাদির সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করার জন্য মানুষকে বলা হয়েছে।

আল্লাহ শব্দটার দাওয়াত দা'য়ীর যিন্দেগীকে রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে। এইজন্য এমন সব ধর্মগুলোতে দাওয়াতের হুকুম ছিল না। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যাবে, সেগুলো ইতিহাসের পাতার মধ্যে

দাফন হয়ে গেছে। আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে সেগুলো নিজেদের সীমানার মধ্যে প্রতিক্রিয়াহীন। তাকে জীবিত বলা অথবা জীবিত মনে করা, ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী, সরাসরি মুনাফেকি ব্যতীত অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই। খতমে নবুওয়াত এর পূর্বে দা'ওয়াতের সকল প্রকার দায়িত্ব আম্বিয়া আলাইহিস সালামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর নবীগণ একের পর এক নবুওয়াতের কাজকে আদায় করেছেন। কিন্তু শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পর নবীজীর নবুওয়াতের ধারাবাহিক ফয়েজ দ্বারা এই উম্মত এমনভাবে উপকৃত হয়েছে। যে দ্বীনের দাওয়াত যা নাকি আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনের একমাত্র কাজ ছিল। العلماء ورثة الانبياء আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস, একথা বলে এই মহান দায়িত্ব দ্বারা এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন। এই হাদিসের দলিল দ্বারা বুঝা যায় এই জাতি না কখনো فوق كل ذي علم عليم এর উদ্দেশ্যহীন হয়নি। না কখনো আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দা তাঁর ওলি হওয়ার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ এই ফিকিরকে বিস্তার করার জন্য, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে নেয়ার জন্য, এই গুরুত্বপূর্ণ মেহনত করছেন দা'য়ী এ ইসলাম মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা.। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এই সুযোগ দান করেছেন। দুআ করি আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানা সাহেবকে পুরো দুনিয়ার জন্য কবুল করুন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান করুন। আমীন!

মুহাম্মদ সালিম কাসিমী
দারুল উলূম দেওবন্দ (ওয়াকফ)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমরা সেই জাতি, শ্রেষ্ঠ উম্মত যার উপাধি	১৭
দাওয়াতি বিষয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ	১৭
মানুষের দুটি শক্তি	১৭
শৃঙ্খলা ভেঙে যাওয়াও একটি দুর্ঘটনা	১৯
হেকমতপূর্ণ ভিত্তিতে উঁচু নিচুর ধারণা	২১
গ্রহীতার তুলনায় দাতা সর্বদায় উত্তম থাকে	২২
তোমার দ্বারা নেয়া হবে দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ	২৩
দাওয়াতি কাজে উদাসীনতা জাতির জন্য দুর্ঘটনা	২৪
তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা মিটানোই হলো এর সমাধান	২৫
শাইখ আবুল হাসান নুরী (রহ.)-এর ঘটনা	২৬
শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান শুধুমাত্র দা'য়ীর অধিকার	২৮
দা'য়ীর সম্মান ও মর্যাদার একটি ঘটনা	২৯
দা'য়ী না হলে মাদউ হতে হয়	৩৩
পথ শুধু একটি	৩৫
মূর্তিও কখনো হেদায়েতের মাধ্যম হয়ে যায়	৩৫
এটা জাতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তো নয় ?	৩৭
আমাদের মেজাজ	৩৮
ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও একটি উদাহরণ	৪০
নববী কাজ ও চরিত্রের সাথে সম্পর্ক খুবই জরুরি	৪১
প্রথমে কাদের সংশোধন: মুসলমানদের না মুশরিকদের	৪২
কালিমায়ে শাহাদাত একটি অঙ্গীকার	৪৩
ভালো কাজকে পছন্দ করাই যথেষ্ট নয়	৪৫
দাওয়াতি কাজ ঈমানী দায়িত্বঃ তারই একটি দিক	৪৭
আমানতের হক ৩টি	৪৭
ঈমানও একটি আমানত	৪৮
দাওয়াতি কাজ নিজের ঈমানের জন্যও জরুরি	৫০
এখলাসের মাপকাঠি	৫২

দাওয়াতি কাজ আবেদদের জন্য নাজাতের পথ	৫৩
জিকিরকারীদেও জন্য দাওয়াত হল আসল জিকির	৫৭
দাওয়াতি কাজ মাদরাসা ওয়ালাদের জন্য রয়েছে কাজের পথ	৬১
লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা	৬৪
উত্তর দেয়ার পদ্ধতি	৬৭
দাওয়াত হলো দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার সরল পথ	৬৯
নবীজীর ভালোবাসা হলো এক মহা সম্পদ	৭২
দাওয়াত ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হক আদায় হয় না	৭৬
দাওয়াতি কাজ ত্যাগ করায় আখেরাতের লাঞ্ছনা	৭৭
বিজয়ীদের জন্য একটি পথ হলো দাওয়াত	৭৯
আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের জন্য দাওয়াত হলো আত্মশুদ্ধির পথ	৮০
দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে কিভাবে?	৮১
ওই জাতি উত্তম জাতি যার উপাধি ছিল	৮৪
এক ঈমানদিপ্ত ঘটনা	৮৬
দাওয়াতের ফিকির	৮৮
ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের বড়দের নীতিমালা	৯০
আমাদের প্রতিটি কাজ হবে দেহধারী দাওয়াত	৯১
আবার জেগে উঠুক ইবরাহিমী ঈমান	৯২
দাওয়াতের পদ্ধতি	৯৩
কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন দুআ	৯৪
দা'য়ীর প্রশিক্ষণ	৯৫
দাওয়াতের পথে মন পরিষ্কার হওয়া জরুরী	৯৬
ইতিবাচক ফিকির অন্তর খোলার একটি লাভ	৯৮
হযরত ওয়াহশির কাছে ইসলামের দাওয়াত	৯৯
তুমি কি ভাবছ যে ফুলের মাঝে কাঁটা	১০২
নবীজীর আনুগত্যের দাবি ঃ একটি পর্যালোচনা	১০৪
দা'য়ীর দুটি গুণ	১০৫
দাওয়াতি সাফল্যের সহজ পথ	১০৬

আমরা সেই জাতি, শ্রেষ্ঠ উম্মত যার উপাধি

দাওয়াতি বিষয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ

জগত সৃষ্টির নীতি ঃ এই বিশ্বের স্রষ্টা এবং পরিচালক হলেন সেই মহান সত্তা, যিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। সবকিছু দেখেন। নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশ্বের বস্তুসমূহকে বিভিন্ন স্তরভেদে মর্যাদা দান করেছেন। এছাড়া সৃষ্টির মাঝে বানিয়েছেন উঁচু-নিচুর স্তর। রেখেছেন সুন্দর ব্যবস্থাপনা, ঘটিয়েছেন কুদরতের উত্তম বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল বানানোর জন্য কিছু জিনিসকে বানিয়েছেন রাজা আর কিছু প্রজা। এই বিন্যাসের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন শ্রেষ্ঠতম ও নিম্নতর স্তর। তাঁর জ্ঞান প্রজ্ঞা ও ইচ্ছায় সম্মানিত বস্তুকে দান করেছেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। অন্যান্য বস্তুকে দিয়েছেন নিম্নতর স্তর। সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বস্তুকে রেখেছেন উপরে। যেমন আরশ, কুরসি, জান্নাত এসব জিনিসের মর্যাদা ও স্থান হলো সর্বোচ্চ আসনে। এর বিপরীতে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তুকে রেখেছেন সর্বনিম্ন স্থানে। যেমন জাহান্নাম যার স্থান সর্বনিম্নে। বিশ্ব জগতসমূহের স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী আল্লাহ যেই বস্তু যেই স্থানের জন্য উপযুক্ত, তাকে সেই স্থানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। প্রতিটি বস্তু যদি তার স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে এই বিশ্বের নেজাম ও শৃঙ্খলা সুন্দরভাবে চলবে। যেখানেই শৃঙ্খলার পরিবর্তন আসবে, সেখানেই নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে। এমনকি স্তরগুলোর পরিবর্তনকে দুর্ঘটনা বা এক্সিডেন্ট বলা হবে।

মানুষের দুটি শক্তি

এই প্রকৃত সত্য বিষয়টি আমরা চলমান জীবনে দেখতে পাই, তার অস্তিত্ব নিজের ভিতরে অনুভব করতে পারি, তাহলো– মানুষের অস্তিত্বই হলো একটি জগত। যার মধ্যে রয়েছে সব জিনিসের নমুনা। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক বলেন–

وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

অর্থ: এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? নিজেদের মধ্যেই রয়েছে (নিদর্শনাবলী) তোমরা কি দেখ না?

-সূরা জারিয়াত-২১

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের মধ্যে দুটি শক্তি আছে। একটি হলো রূহ্, যার সম্পর্ক হলো ঊর্ধ্বজগতের সাথে। অপরটি হলো নফস, যার সম্পর্ক নিম্নজগতের সাথে। তাই রূহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন–

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْ حِ قُلِ الرُّوْ حُ مِنْ أَمْرِ رَبِّىْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا

অর্থ: তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। -বনী ইসরাইল–৮৫

নফস সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন–

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

অর্থ: আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেই।

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। -ইউসুফ–৫৩

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো নফসের সম্পর্ক নিম্ন জগতের সাথে। এখন মানব জীবনের সফরকে সুশৃঙ্খল এবং আল্লাহর ইচ্ছামতো চলার জন্য প্রয়োজন হলো রূহ। এর অবস্থান হলো বাহন এর মতো। আর নফসের অবস্থান হলো আরোহীর ন্যায়। আর আরোহী নিজ বাহনের অধীনে থাকে। মনগড়া জীবনের উপর আল্লাহর চাওয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে। যদি নফসের প্রশিক্ষণ না হয়, আর নফসের অবাধ্যতা যদি রূহের উপর বিজয় লাভ করে তখন জীবনকে দুর্ঘটনার শিকার বলে মনে করা হবে।

শৃঙ্খলা ভেঙে যাওয়াও একটি দুর্ঘটনা

কোনো কোম্পানি যখন একটি গাড়ি তৈরি করে, তাতে কিছু জিনিস বানানো হয়। কিছু তৈরি করা হয় উপরে রাখার জন্য, আর কিছু নিচের জন্য। যদি উপরের জিনিসটি নিচে রাখা হয়, আর নিচেরটি উপরে, তাহলে এটাকেও দুর্ঘটনা বলা হবে। যেমন, গাড়ির চাকা নিচে থাকে, আর মেশিন থাকে উপরে। চলন্ত গাড়ি যদি উল্টে যায় তাহলে চাকাগুলো থাকবে উপরে আর ছাদ ও সিট থাকবে নিচে। এমতাবস্থায় শুধু গাড়ির আরোহীগণই আহত হবেন না। বরং দুর্ঘটনাস্থল; সেখানকার লোকজন ও জিনিসপত্রও

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর বহু উদাহরণ আছে। ঘরের ছাদ থাকে উপরে আর ফ্লোর থাকে নিচে। যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে এটাকে দুর্ঘটনা বলা হবে। দুনিয়ার সব জিনিসের মধ্যেই রয়েছে এই মূলনীতি। আল্লাহর অমোঘ বিধান অনুযায়ী এ কথাই বুঝা যায় আপনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই বিধানই দেখতে পাবেন। এমনকি মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যেও এর বাস্তবতা ফুটে ওঠে। শরীরের যেই অঙ্গটি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ তাকে রাখা হয়েছে উপরে। তার বিপরীত অঙ্গকে রাখা হয়েছে নিম্নে ও নিচু স্তরে। যেমন মাথা হলো অঙ্গের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ। তাকে রাখা হয়েছে উপরে। আর পাকে মনে করা হয় নিচ। তার স্থান হলো নিচে। আকল বুদ্ধির অবস্থান হলো বাদশাহর মতো। পায়ের অবস্থান হলো গোলামের মতো। গোলামের বেলাও এই মূলনীতি রাখা হয়েছে। সম্মানিত পোশাক (টুপি) মাথায় রাখা হয়। আর পায়ের পোশাক জুতাকে রাখা হয় মাটিতে, যা মিলে থকে ময়লা আবর্জনার সাথে। এখন যদি মাথা এবং টুপিকে নিচে রাখা হয়, আর জুতা এবং পা রাখা হয় উপরে। তাহলে এটাকেও দুর্ঘটনা বলা হবে। একটু আগে বেড়ে একথা বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার সকল সৃষ্টির মাঝে যেই শৃঙ্খলা ও তারতীব রয়েছে এবং বিশ্বের স্রষ্টা যাকে যেই স্থানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। সেই শৃঙ্খলা যখনই উল্টে যাবে, তখনই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে মাখলুকের বিভিন্ন অঙ্গ বা সম্প্রদায়ের এবং বংশের নির্দিষ্ট স্তরগুলো যখন উল্টে যাবে, তখন সেই জাতি বা বংশের কেয়ামতই বলা হবে। এ ব্যাপারে আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। আল্লাহ পাক বলেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

অর্থ: পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ্ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে

আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ। -নিসা-৩৪

এটা প্রাকৃতিক মূলনীতি। নারীগণ পুরুষের উপর আদিষ্ট এমন চরিত্র যদি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে কমপক্ষে তাকে কেয়ামতের আলামত বলা হবে। এখানে এ কথাও স্পষ্ট হওয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে যে, বর্তমান পশ্চিমা সংস্কৃতির যেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তা কেবল অপ্রাকৃতিকই নয় বরং অসম্ভব। মানুষ ও বিশ্বজগতকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেককে তার নিজ আসনে মর্যাদার স্থান দিয়ে দুনিয়ার নেজাম ও শৃঙ্খলা ঠিক রেখেছেন। অন্যথায় এই সুবিন্যস্ত নেজামের উপর চলা অসম্ভব হবে। পিতা-পুত্র কি কখনো এক হয়? স্বামী-স্ত্রীর অধিকার কি সমান হওয়া সম্ভব? ইমাম ও মুক্তাদির মযার্দা কি সমান হতে পারে? রাজা-আর প্রজা কি সমমর্যাদার হতে পারে? এই সমান অধিকারের নির্বুদ্ধিতার বুলি, পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে অসংগতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? ইসলাম হলো প্রাকৃতিক ধর্ম। ইসলাম পরস্পর সমতার শুধু শিক্ষাই দেয়নি বরং কার্যত নমুনা উপস্থাপনও করেছে। এমনভাবে স্তর ও মর্যাদার প্রাকৃতিক বন্ধনের সাথে মিলিয়েছে, যাতে কোনো মানুষ বা সৃষ্টি যেন জুলুমের শিকার না হয়। ইসলাম এভাবেই প্রত্যেকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনকি প্রত্যেকের হক, সম্মান কিভাবে আদায় করা যায় তার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উপরের বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এই বিশ্বের শৃঙ্খলায় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সম্মানিত সৃষ্টি ও জিনিসকে উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। আর তুচ্ছ জিনিসকে রেখেছেন নিম্নস্থানে। এ কথাটি এভাবেও বলা যেতে পারে যে, উঁচু ও উপরের জিনিস হলো ইজ্জত-সম্মান পাওয়ার যোগ্য। আর নিচের জিনিস হলো তুচ্ছ ও অমর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। একথাও ঠিক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মানুষ এবং সমস্ত জিনিস নিজ প্রাকৃতিক স্থানে স্থির থাকবে ততক্ষণ দুনিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মে চলতে থাকবে। যখন তার মর্যাদার শৃঙ্খলা উল্টে যাবে, তখন তাকে বলা হবে দুর্ঘটনা। এর দ্বারা শুধু রীতি-নীতির মধ্যেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না, বরং উপস্থিত সকল বস্তু ও মানুষও প্রভাবিত হবে। আর এটা এক ধরনের ছোট কেয়ামত হয়ে যাবে। একই সাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তখন নিয়ন্ত্রিত জিনিসকে উল্টে দেন। লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তির বর্ণনা কুরআনে কারিমে পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ

অর্থ: অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (হিজর-৭৪)

হেকমতপূর্ণ ভিত্তিতে উঁচু নিচুর ধারণা

আল্লাহ যাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেছেন, সেই বাস্তব দৃষ্টি দ্বারা যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সম্মান ও অসম্মানের যেই পদ্ধতি, তার ভিত্তি খুবই হেকমতপূর্ণ। বিশ্ববাসীর জন্য রয়েছে এর মধ্যে কল্যাণ। বিশেষত মুসলিম জাতির জন্য রয়েছে মহা নেয়ামত। মানবতার কা ারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐশী বাণী দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন , "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে মুজিযা দান করা হয়েছে তার অন্যতম একটি হলো جوامع الكلم (সার গর্ভকথা) তাঁর কথা এতটাই অর্থবহ হতো যে, বিশেণ্ঢষক তা বিশেণ্ঢষণ করতে ব্যর্থ হয়ে যায়। নবীজীর বাণীর সামনে মাথানত করা ছাড়া আর কোনো উপায় তাদের সামনে থাকে না। একটু চিন্তা করুন– উপরের বস্তুকে সম্মান ও ইজ্জত আর নিচের বস্তুকে অসম্মান ও তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে। বলা হচ্ছে উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। গ্রহীতার হাত নিচে প্রশস্ত করতে হয়। আর দাতার হাত ইজ্জত ও সম্মানের সাথে উপরে থাকে। এ কথা বাস্তব সত্য যে, দাতা কোনো কিছু দান করলে নিজের মধ্যে স্বস্তি ও সম্মান বোধ করে। আর গ্রহীতা শিকার হয় হীনম্মন্যতার। স্বাভাবিক ভাবেই দাতা সর্বদায় নিজেকে সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করে। আর গ্রহীতা স্বভাবগতভাবেই নিজেকে নিচু ভাবে ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। এ কারণেই বুযুর্গদের কাছে হাদিয়া পেশ করার আদব হলো হাদিয়ার বস্তুটি দুই হাতের উপরে রাখা, যাতে শায়খের হাত উপরে থাকে, হাদিয়া গ্রহণ করা অবস্থায় যেন তার ইজ্জত মর্যাদা ঠিক থাকে।

গ্রহীতার তুলনায় দাতা সর্বদায় উত্তম থাকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর বাণী –

اليد العليا خير من اليد السفلي

(উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম) দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দাতা যত মূল্যবান বস্তু দান করবে, সেই পরিমাণ সম্মানিত শ্রদ্ধেয় হবে। গ্রহীতার মধ্যে সেই পরিমাণ ধন্যবাদ প্রদানের উপলব্ধি হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ও ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষণীয় সববিষয়। প্রতিটি মুসলমান একথা বিশ্বাস করে– ঈমান ও ইসলামের কাছে আসমান-জমিন, পুরো পৃথিবী মূল্যহীন। যিনি মুসলিম জাতিকে ইসলামের পূর্ণতার সম্পদ দান করেছেন এবং ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ নেয়ামত বলে ঘোষণা দিয়েছেন–

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে নির্বাচন করলাম।

-সূরা আল- মায়েদা- ৩

হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল গনী ফুলপুরী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে ধর্ম বানিয়ে খুশি হয়েছেন। এটা কত বড় নেয়ামত যা দান করে বিশ্বের মালিক নিজেই খুশি হয়ে গেছেন। আবার এই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির মাথা উঁচু করে দিয়েছেন। সম্মান ও সৌভাগ্য, সম্পদ ও রাজত্ব দান করেছেন এবং এই জাতিকে দা'য়ী জাতি বানিয়েছেন। আল্লাহর দিকে দাওয়াত তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য বানিয়েছেন। অর্থাৎ এই জাতিকে দেনেওয়ালা উম্মত বানিয়েছেন এবং বানিয়েছেন উত্তম হাতের প্রতীক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ (*110*)

অর্থ: তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই

তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। -সূরা-আলে-ইমরান-১১০

তোমার দ্বারা নেয়া হবে দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ

কুরআনের সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ঘোষণা– সকল জাতির নেতৃত্ব তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। ইজ্জত ও মহত্বের মালিক তো তোমরা। সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার পায়ে চুম্বন করবে। শান-শওকত মান-মর্যাদা তোমাদের দাস হয়ে আসবে। এজন্যই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, তোমাদের মহত্ব। তোমাদের (أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া। তোমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা। এখানে আল্লাহর উপর ঈমান আনার কথা সবার পরে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি জিনিস আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত ঈমান। এখানে উত্তম হওয়ার কারণ, ঈমানের দাওয়াত। কারণ দুনিয়ার অনেক পূর্ববর্তী জাতি এই ঈমান গ্রহণ করেছে। কিন্তু দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য শুধু তোমাদেরই। এর সাথে কোনো অংশীদারিত্ব নেই। একথা বাস্তব যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই জাতি দাতা হয়ে থাকবে এবং দা'য়ীজাতি হওয়ার দায়িত্ব পালন করবে, সম্মান-মর্যাদা শান-শওকত, রাজত্ব ও নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত তাদেরই থাকবে। আর যখন এই জাতি দা'য়ী হওয়ার সম্মানিত মর্যাদাকে ছেড়ে দেয়, দা'য়ীর স্থানে 'মাদউ', (দাওয়াত গ্রহীতা) হয়ে যায়। তখন অন্যান্য জাতি তাদের উপর চেপে বসবে। আর সকল জাতি তোমাদেরকে মাদউ বানাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ঠিক তখনই এই সম্মানিত জাতি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান-অপদস্ত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, দাসত্ব ও পরাজয় শিকার করে দুনিয়ার সাধারণ সৃষ্ট জীবের মতো নগণ্য হয়ে যাবে। তখন এ কথা বলার সুযোগ থাকবে না– হে প্রতিপালক কাল কেন আমার উপরে নিষ্ঠুর হয়ে গেলে...।

দাওয়াতি কাজে উদাসীনতা জাতির জন্য দুর্ঘটনা

জাতির সামনে বিদ্যমান সমস্যাগুলো যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সব লাঞ্ছনার মূল কারণ হলো, যেই জাতি দাতা হিসেবে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এসেছিল, সেই জাতি আজ

গ্রহণকারী মাদউতে পরিণত হয়েছে। ইজ্জত, সম্মান-মর্যাদা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও চরিত্রের সম্পদে সুসজ্জিত উত্তম জাতি নিজেদের সম্পদ হারিয়ে ফেলর কারণেই বিধ্বস্থ ধর্ম, পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত জাতির মুখাপেক্ষী হচ্ছে। এ কারণে সে লাঞ্ছনা, অপদস্থতা,ও নীচুতার গভীর গর্তে দাফন হতে চলেছে। তারা শুধু নিজেরা অপদস্থতার শিকার হচ্ছে না বরং পুরো মানবজাতির জন্য একটি দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে। যেই জাতির অবস্থান ছিল উপরে, নামতে নামতে সে জাতি নিচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

দা'য়ীজাতি যদি মাদউ (দাওয়াত গ্রহণকারী) হয়ে যায় তাহলে এটাও একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা। এটি মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের শাস্তি। মানুষের জন্য এটা যদি ছোট কেয়ামত নাও হয়, কেয়ামতের লক্ষণ অবশ্যই। এই দুর্ঘটনা মানব সন্তানদের দুর্ঘটনা না হলেও ঘটনাস্থলে পতিত অন্যান্য জাতি এই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যায়। দা'য়ীজাতি যখন তার দায়িত্ব 'দাওয়াতকে' ছেড়ে দিল তখন পৃথিবীতে কুফর, শিরকের সয়লাব হতে লাগল। ঈমানী ঢেউ স্তিমিত হতে লাগল। ধারাবাহিকভাবে এই অধঃপতন চূড়ান্তে পৌছতে লাগল। এভাবে এক সময় আসবে যখন পৃথিবীতে কোনো ঈমানদার অবশিষ্ট থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী তখন কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পুরো দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার সিদ্ধান্ত হয় ঈমানদারদের আমল অনুযায়ী। কাফের মুশরিকদের আমলের শাস্তি দেয়া হবে মৃত্যুর পর। মুসলিম জাতি তার দাওয়াতের উদাসীনতার কারণে দুনিয়াতেই যে শাস্তি ভোগ করবে তা কল্পনাও করা যাবে না।

তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা মিটানোই হলো এর সমাধান

এই মুসলিম জাতি যদি নিজ পূর্বসূরিদের মাঝে সম্মান, মর্যাদা ও বিজয় অন্বেষণ করতে চায়, তাহলে তার জন্য উচিত দা'য়ীজাতি এবং اليد العليا উপরের হাত হয়ে থাকবে। এছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এই উম্মতের সংশোধন ওইভাবেই হবে, যে ভাবে, যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তীদের সংশোধন হয়েছিল। এ বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন। সে দাতা হবে, না গ্রহীতা হবে। জাগতিক ও আর্থিক জিনিসের মধ্যেও যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব– যে ব্যক্তি দাতা হতে চায়, সে যদি ফকিরও হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে দাতা বানিয়ে দেন। আর যেই

ব্যক্তি গ্রহীতা হয়, সে যত বড় ধনীই হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে নিচের হাতের প্রতীক বানিয়ে দেন। এমন অনেক সুদখোর মহাজন আছে যাদের ধন-সম্পদের পাহাড় থাকা সত্ত্বেও গরিবদের রক্ত চুষে নেয়। এমন অনেক অসচ্ছল ব্যক্তি আছে, তাদের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও চূড়ান্তপর্যায়ের দান ও অন্যকে অনুগ্রহ করার চেষ্টা করে। সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা ভিক্ষা দেয়ার জন্য অন্যের কাছ থেকে চেয়ে আনে।

শাইখ আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর ঘটনা

আওয়ারিফুল মা'আরিফের লেখক শাইখ আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে হাত পাতলেন। সেখানে জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর এক মুরিদ উপস্থিত ছিল। তিনি এই ঘটনা দেখে খুবই অবাক হলেন। কারণ শাইখ আবুল হাসান নূরী (রহ.) সে যুগের বড় ওলী ছিলেন। আর তিনি গাইরুল্লাহর কাছে হাত বাড়িয়েছেন। সেই মুরিদ শাইখ জুনাইদ (রহ.)-এর কাছে অভিযোগ করল, বলল শাইখ আবুল হাসান নূরী ওলামা মাশায়েখদের মান-সম্মানকে খাটো করছেন। হযরত জুনাইদ (রহ.) বললেন, শাইখ আবুল হাসান আল্লাহর ওলীদের একজন। তিনি নিজের জন্য চাচ্ছেন না। কাউকে দেয়ার জন্য হয়তো হাত বাড়িয়েছেন। আবার এ কথাও খেয়াল হলো– আল্লাহ না করুন, শাইখ আবুল হাসান সাহেব যদি তিনদিন ক্ষুধার্ত থাকেন। ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য, তার হাত বাড়ানো জায়েয হয়ে যাওয়ার কথা।

মুরিদকে বললেন, একটি পাল্লা নিয়ে এসো, তিনি একশত দেরহাম মেপে একটি পাত্রে সদকার নিয়তে শাইখ আবুল হাসান (রহ.)-এর খেদমতে পাঠালেন। আর সাথে কিছু হাদিয়াও দিলেন এবং সেই মুরিদকেই শাইখের খেদমতে পাঠালেন। শাইখ আবুল হাসান (রহ.) এ সবগুলো দেখেই বললেন– জুনাইদ বাগদাদী খুব চতুর মানুষ। তিনি নিজের হাতে লাড্ডু রেখে দিতে চান। শাইখ আবুল হাসান একটি পাল্লা আনালেন, একশত দেরহাম মেপে অতিরিক্ত দেরহামগুলো নিজের কাছে রেখে দিলেন। আর সদকার ১০০ দেরহাম জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, যেগুলো আমার ছিল, সেগুলো গ্রহণ করলাম। আর জুনাইদ নিজের মতলবের জন্য যেগুলো দিয়েছিল, সেগুলো ফেরত

পাঠালাম। আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দরবারের ফকির নই। সেই মুরিদ খুব আশ্চর্যান্বিত ও অস্থির হয়ে ফিরে এলো। তার বুঝেই এল না যে, শায়খ জুনাইদ (রহ.) ১০০ দেরহাম মাপার পর অতিরিক্ত দেরহামগুলো কেন দিলেন। আবার শায়খ আবুল হাসান নূরী অতিরিক্ত দেরহাম রেখে বাকি ১০০ দেরহাম ফেরত দিলেনইবা কেন?

মুরিদ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর খেদমতে এসে শায়েখ আবুল হাসান (রহ.)-এর বার্তা পৌঁছালেন। আর ১০০ দেরহাম ফেরত দিয়ে বিনয়ের সাথে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত জুনাইদ (রহ.) বললেন, আমিতো পূর্বেই বলেছি শায়খ আবুল হাসান নূরী জামানার ওলী। তিনি নিজে নেয়ার জন্য হাত বাড়াননি বরং অন্য কাউকে দেয়ার জন্য চেয়েছেন। তার পরও তোমার বলার কারণে কোনো প্রয়োজন পড়ল কিনা এই জন্য আমি ১০০ দেরহাম সদকার নিয়তে দিয়েছিলাম। সেই সদ্‌কা আমার উপকারে আসবে। আবার চিন্তা করলাম শায়খ আবুল হাসান এই যুগের ওলি, তার কাছে কিছু হাদিয়া পাঠানো উচিত। তাই আমি দুই হাত ভরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাদিয়া হিসেবে অতিরিক্ত দেরহাম দিলাম। শায়খ আবুল হাসান (রহ.) হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। আর সাদকা ফেরত দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দরবারে ফকির হই না। এবার গিয়ে তুমি তাকে মসজিদের বাহিরে হাত পাতার কারণ জিজ্ঞাসা কর।

মুরিদ শায়খ আবুল হাসান (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তাঁকে মসজিদের সামনে সওয়াল করার কারণ জিজ্ঞাসা করল। শায়খ উত্তর দিলেন, সেদিন আমার অন্তরে এই কথা আসল যে, আজকে আল্লাহর যেই বান্দা আমার সাথে উত্তম মু'আমালা করবে আল্লাহ তাকে নিজের বিশেষ রহমত ও সন্তুষ্টি দান করবেন। তাই আমি ভাবলাম যত বেশি মানুষ আমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, সকলেই সেই রহমত ও খুশি উপলব্ধি করতে পারবে। বাহ্যত আমার সওয়াল করা দ্বারা লজ্জিত হবো বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার নিজের জন্য গ্রহণ করার নিয়ত ছিল না। নিয়ত ছিল দেয়ার। এই জন্যই আমি মসজিদে মানুষের সামনে হাত প্রসারিত করেছি। এমন কত মানুষ আছে, যারা মানুষের কাছে হাত বাড়ায় অন্যকে দেয়ার জন্য। অন্যদিকে এমন অনেক সম্পদশালী লোক আছে, যারা দান করে কিন্তু উদ্দেশ্য গ্রহণ করা। বর্তমান রাজনীতিকদের অবস্থা সকলের সামনে সুস্পষ্ট।

বাহ্যতভাবে তারা দাতা হয়ে আসে, কিন্তু ভিতরে থাকে গ্রহণ করার আশা, ভোট ভিক্ষা চাওয়া। এজন্য মানবতার মুক্তির দূত খাইরুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"সবচেয়ে উত্তম ধনী হলো মনের ধনী।" আর নফসের প্রাচুর্য আসে অল্পতুষ্টির মাধ্যমে। দ্বীন ও দুনিয়ার দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এই বাস্তবতা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্বের মালিক আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের মহান সম্পদ দান করে, সকল প্রকার মুখাপেক্ষি এবং দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। অমুখাপেক্ষি করেছেন। এর পরও অন্যের দরবারে হাত প্রশস্ত করা এবং অন্য ধর্মের কৃষ্টি-কালচারের দিকে চোখ উঠাতে হয় কেন?

সেই এক সেজদা যাতে তুমি মনে কর তুচ্ছ। হাজার সেজদা থেকে মানুষকে তিনি করেন মুক্ত।

শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান শুধুমাত্র দা'য়ীর অধিকার

ইতিহাসের পাতায় যদি দেখা হয়, তাহলে একথা স্বাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতের সাথে জড়িয়ে দিয়েছেন দাপট, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব এবং আত্মমর্যাদাবোধ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দা'য়ীকে দেখতে যতই দুর্বল, গরিব ও অজ্ঞ মনে হোক না কেন, কিন্তু তাকে দেয়া হয়েছে দাপট, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব ও মর্যাদা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সত্যের দাওয়াত দান করে। মাদউ (যাকে দাওয়াত দেয়া হয়) দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে, অস্বীকার ও কুফরী করে এবং বিরোধিতায় আসে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা মাদউ জাতিকে দাওয়াতের ইতমামে হুজ্জত আদায় হওয়ার পর, তার শক্তি দ্বারা মিটিয়ে দিবেন। আর দা'য়ী জাতিকে মাদউ জাতির রাজত্ব ও বাদশাহীর ওয়ারিস বানিয়ে দেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা যত আম্বিয়া (আ.) ও তাদের সম্প্রদায়ের ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন, ঐ সব ঘটনা সমূহের মধ্যে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীদের সান্ত্বনার জন্য, এই পবিত্র অভ্যাসের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত আম্বিয়া (আ.) তার জাতির সাথে কথপোকথনের যেই রেকর্ড কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে তার উপর চিন্তা-ভাবনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়। দা'য়ীকে প্রভাব শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব ও সম্মানের অধিকার দান করা হয়েছে। আর মাদউর জন্য লাঞ্ছনার ভয় এবং প্রজা হওয়ার শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটা একটি বাস্তব সত্য যে, আম্বিয়া (আ.)-এর

ঘটনাসমূহ যদি একটু সুচিন্তিতভাবে অধ্যয়ন করা যায়, তাহলে একজন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি দাওয়াতের মহত্বকে স্বীকার করে নিবে। উদাহরণস্বরূপ মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার মধ্যে দা'য়ীর সম্মান ও মর্যাদা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, গাম্ভীর্যতা যা খুলে খুলে বলা হয়েছে।

দা'য়ীর সম্মান ও মর্যাদার একটি ঘটনা

হযরত মুসা (আ.) হলেন বনী ইসরাইলের পুরনো এবং জাগতিক দিক থেকেও অবশিষ্ট এক মজলুম জাতির একজন সদস্য। বাহ্যত ফেরাউনের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন। কিবতিকে ঘুঁষি মারা এবং তাকে হত্যা করার কারণে ফেরাউন ছিল তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত। তাঁর মুখে জড়তা ছিল। ফলে তার ভাই হারুন (আ.) কে নবী বানানোর জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করেছিলেন। নবুওয়াত দান করার সময় নিম্নের ভাষায় দু'আ করলেন–

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِىْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِىْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِىْ ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِىْ ۝ وَاجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِىْ ۝ هَارُوْنَ أَخِىْ ۝ اشْدُدْ بِهٖ أَزْرِىْ ۝ وَأَشْرِكْهُ فِىْ أَمْرِىْ ۝ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى ۝ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰى ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلٰى أُمِّكَ مَا يُوْحٰى ۝

অর্থ: মুসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুন। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। আল্লাহ বললেন, হে মুসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো। আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে। -সূরা ত্বহা- ২৫-৩৮

অন্য একস্থানে মুসা আলাইহিস সালাম এর আবেদন এই ভাবে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ رَبِّ إِنِّـىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْنِ ۝ وَأَخِـىْ هَارُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّـىْ لِسَانًا فَأَرْسِلْـهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِـىْ إِنِّـىْ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُوْنِ

অর্থ: মুসা বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। আমার ভাই হারুন, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।-সূরা কাসাস-৩৩-৩৪

হযরত মুসা (আ.)-এর অক্ষমতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُوْنَ

অর্থ: আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌছাতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলির জোরে তোমার এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।-সূরা কাসাস-৩৫

ইরশাদ হলো, প্রকাশ্যে তোমাকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তোমার মনের প্রশান্তির জন্য তোমার ভাইকে তোমার সহযোগী বানাচ্ছি এবং তোমাদের দুজনের দাওয়াতের মর্যাদার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব ও দাপট দান করেছি। আর তোমাদের হেফাজতের দায়িত্ব নিচ্ছি। তারা তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। আর তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তোমরা দুজন এবং তোমাদের অনুসারীদেরকে বিজয় দান করব।

এখানে এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, দা'য়ী যখন তার দায়িত্ব পালনের জন্য ময়দানে নেমে যায় এবং এই পবিত্র কাজের উপকরণের প্রয়োজন বোধ করে যদি আল্লাহর দরবারে দুআ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার পক্ষ থেকে তা পূরণ করে দেন। অন্য এক স্থানে তাঁদের দু'জনের ফেরাউনের কাছে গমন ও তার সাথে সংলাপের কথা আলোচনা করা হয়েছে। একদিকে হযরত মুসা (আ.) বাহ্যত ফেরাউনের সাহায্য, দয়া-মায়ায় লালিত পালিত হয়েছেন। কিবতির হত্যা সংক্রান্ত অপবাদে পলাতক ব্যক্তি। অপরদিকে ফেরাউনের মতো অত্যাচারি বাদশাহ, প্রভুর দাবিদার। কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দা'য়ী। আর ফেরাউন হলো মাদউ। এই প্রেক্ষাপটে কুরআনে কারিমের এই আয়াত পড়ুন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِذْجَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّى لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا

অর্থ : তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, ফিরাউন তাহকে বলিয়াছিল, হে মূসা! আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।-সূরা বনী ইসরাইল - ১০১

দেখুন এখানে দা'য়ীর দাপট আর মাদউর ভয়। কত খোশামোদির সাথে ফেরাউন প্রভাবিত হয়ে বলছে, হে মুসা আমার মনে হচ্ছে তোমাকে কেউ জাদু করে দিয়েছে। তুমি তো এমন ছিলে না। তোমার উপর কোনো উপরি প্রভাব হয়েছে। হযরত মুসা (আ.)-এর প্রভাব ও দাপট দেখেন: সে সময়ের বাদশাহ, সিংহাসনে বসা কিন্তু সেই দরবারে পৌছে নির্বিঘ্নে উত্তর দিচ্ছেন।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّـىْ لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا.

তিনি বললেন : তুমি জান যে, আসমান ও যমিনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণা তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।-সূরা বনি ইসরাইল -১০২

একটু চিন্তা করুন, কী ধরনের প্রভাবপূর্ণ উত্তর? যেন বলছেন, তুমি খুব ভালো করে জেনে রাখো, আমি যেই বার্তাগুলো পৌছাচ্ছি, তা আসমানের মালিকের পক্ষ থেকে যাতে তোমার চোখ খোলে যায়।

এর পর বললেন, হে ফেরাউন! আমার তো মনে হয়, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, দুর্ভাগ্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে বনী ইসরায়েলের ইতিহাস সাক্ষী, যে, দাওয়াতের হুজ্জত পেশ করার পর, অস্বীকারকারীকে দেয়া হয়েছে। মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) এবং তাদের ভুখ্ থেকে বনী ইসরায়েলকে তার ওয়ারিস বানানো হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ ۝ وَكُنُوْزٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝ كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِـىْ إِسْرَائِيْلَ .

অতঃপর আমি ফেরাউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ

থেকে বহিষ্কার করলাম এবং ধন-ভা ার ও মনোরম স্থান সমূহ থেকে। এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক।

-আশ্শুআরা- ৫৭-৫৯

এই প্রভাব, ওয়াকার, ফেরাউনের মতো অত্যাচারী, জালেম বাদশার সামনে দেখানো এটা দা'য়ীর মাকাম, স্তর যা মুসা (আ.) কে দান করা হয়েছিল। এটা শুধু মুসা (আ.)-এর সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং সকল নবীকে এই মাকাম, স্তর দান করা হয়েছে। এ কথা ঠিক, দাওয়াতের পূর্ণতা ও দৃঢ়তার জন্য শুরুতে কিছু পরীক্ষা আসে। তবে ফল সর্বদা দা'য়ীর পক্ষেই হয়। এই মূলনীতি শুধু আম্বিয়া (আ.) এর সাথে খাস নয়। বরং সত্য দা'য়ী যিনি নববী পদ্ধতিতে কর্মরত অবস্থায় নবীর অনুসরণের প্রতিজ্ঞা করে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে তার সাথেও একই আচরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

كُلًّا نُمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا .

এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত।

-সূরা বনী ইসরাইল-২০

এই জাতি যদি তাদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চায়। তাদের দুনিয়ার বিজয় ও প্রভাব এবং ওয়াকার যদি ঠিক রাখতে চায়। তাহলে তার সমাধান শুধু এটিই যে দা'য়ী উম্মত হয়ে নিজেকে উত্তম জাতি বলে প্রমাণিত করবে। পথভ্রষ্ট মানুষকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের নূর ও আলোর দিকে নিয়ে আসাকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে।

দা'য়ী না হলে মাদউ হতে হয়

এটাও সুস্পষ্ট বাস্তবতা, জাতি যখন দা'য়ী না হবে তখন মাদ'উ হবে। এমন কি লেখকের সামনেও এমন লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। গুজরাটের সফরের সময় স্থানীয় একজন বড় মুবাল্লিগ বলছিলেন, যে বুম্বাই থেকে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাদের দাওয়াতের ভিত্তি হল একত্ববাদ। এটাকে পান্ডুর আন্দল বলা হয়। তাদের কর্মীগণ জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন আশ্রম তৈরি করে। রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এই কর্মীদেরকে বলা

হয় পান্ডে। সেই মুবাল্লিগ সাহেব বললেন, একদিন তাদের একজন কর্মী আমার কাছে এসে কিছু সময় চাইল, বলল আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। আমি তার সাথে কথা বলার জন্য বসে গেলাম। সে কথা শুরু করল– এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য হল এই, এই দুনিয়ার মালিক পালনকর্তা একজন। তাঁর শক্তি হল অপার। তিনি সব কিছু শুনেন, তিনি সকলকে জীবিত করেন, মৃত্যু দান করেন। পুরো পৃথিবীর পরিচালক ও প্রতিপালক তিনি একজনই। দুনিয়ার সকল মানুষ মাত্রই শক্তির পূজা করে। তাহলে এই ঝগড়া ফাসাদ সব শেষ হয়ে যাবে। ঝগড়া তো এই জন্যই– প্রত্যেকে মিথ্যা ভগবান রেখেছে। তিনি তো এমন যিনি আসমান যমিনের স্রষ্টা। তিনি সাধারণ বীজ থেকে বড় বড় বৃক্ষ ও রকমারি ফল ও ফুল বের করেন।

আমি অবাক হলাম, যে একজন অমুসলিম আমাকে একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছে। আমার আশ্চর্যের অন্ত রইল না, যখন সে বলল, তাঁর বড়ত্বের কত নিদর্শন রয়েছে। তিনি গোবর আর রক্তের মধ্যেখান থেকে কত সুন্দর পরিষ্কার দুধ বের করেন।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কুরআন শরিফ পড়েছেন? উত্তর দিল, মানুষ আমাদেরকে অস্পর্শ্য মনে করে। এই জন্য এসব জিনিস আমাদেরকে দেয় না। আমি তো অস্থির থাকি কেউ যদি আমাকে কুরআন পড়তে দেয়। কিন্তু কেউ দেয় না।

চিন্তা করুন, কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোনো আসমানী গ্রন্থে একত্ববাদের পক্ষে আল্লাহর বড়ত্ব ও সৃষ্টিকে প্রমাণিত করার জন্য এ ধরনের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়নি। এটা তো শুধু কুরআনের অলৌকিকতা, যা একজন অমুসলিমের মুখ থেকে বের হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

অর্থ : নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাদের পেটের মধ্যে যে মল ও রক্তের মধ্য হতে খাঁটি দুধ আমি তোমাদের পান করাই, আর পানকারীদের জন্য সেটা হল তৃপ্তিকর।

-সূরা নাহল-৬৬

এর থেকে আর আশ্চর্যের কথা কি হতে পারে, যে আমরা মানবতাকে

কুফর ও শিরক থেকে বের করা এবং মানুষকে একত্ববাদের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্বকে ছেড়ে দিয়েছি। আর আমরা আমাদের প্রিয় নবীকে পাঠানোর উদ্দেশ্যে–

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنَ

অর্থ: তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমা-২

এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। কাগজে লেখা কুরআন থেকে না নিজে উপকৃত হলাম, না অন্যকে তা থেকে উপকৃত করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এই কাগজের ছহিফা ছাড়াও কুরআনের জ্ঞানকে অন্যের অন্তরে ঢেলে দেন। এবং তার দ্বারা মুসলিম জাতিকে দাওয়াত প্রদান করাচ্ছেন। এর কারণ আল্লাহ তাআলা তাওহিদকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করে রাখবেন।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

অর্থ : তিনিই তাঁহার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর উহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

পথ শুধু একটি

এই জন্য শুধু নিজ পূর্বসূরীদের মান-মর্যাদা, শান শওকত এমনকি পুরো দুনিয়ার উপর প্রভাব অর্জনের জন্য এই জাতিকে তার দাওয়াতি দায়িত্ব আদায় করতে হবে। এবং দাতা হয়ে দাওয়াতি মর্যাদার হক আদায় করতে হবে। অন্যথায় অনৈসলামী চিন্তার মাদউ হয়ে বাতিলের খড়কুটো হয়ে ভেসে চলে যেতে হবে। এবং অমুসলিমদের প্রভাবে প্রভাবিত হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

মূর্তিও কখনো হেদায়েতের মাধ্যম হয়ে যায়

ইতিহাস সাক্ষী তিনি যখন কাজ নিতে চান, তখন পাথর জীব-জন্তু মশা মাছি দ্বারাও কাজ নেন। হেদায়াত তো ব্যাপক হবেই। আমরা যদি

আমাদের দায়িত্ব ও অবস্থান না বুঝি তাহলে আল্লাহ অন্য মানুষকে এই কাজের জন্য দাঁড় করাতে পারেন। তিনি যদি হেদায়াত দিতে চান, তাহলে মূর্তির মাধ্যমে হেদায়াত দিতে পারেন। এ সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করছি। পূর্ব মুজাফফর নগরের এক গ্রাম্য যুবক ফুলাতে এল। দেখতে মনে হচ্ছিল অনেক পুরনো মুসলিম। সে তার ভায়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, তাকে কালেমা পড়িয়ে দিন। আমার ভাই মুসলমান হওয়ার জন্য এসেছে। আমি আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞেস করলাম আপনিও কি নও মুসলিম? হ্যাঁ বোধক উত্তর দিল। আমি বললাম– কোন জিনিস আপনাকে ইসলামের দিকে প্রভাবিত করেছে? সে বলতে শুরু করল– আমি একজন কৃষক। গত বছর আখের বাজার ভালো ছিল। ফলে আমি নতুন একটি ঘর নির্মাণ করেছি। সেখানে ছোট করে একটি রুম তৈরি করেছি মূর্তি রাখার জন্য। মুজাফফর নগরে বাজার থেকে সুন্দর দেখে একটি মূর্তি ক্রয় করলাম। একটি খবরের কাগজে মূর্তিটি পেচিয়ে মূল বাজারের একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে আমি হোঁচট খেলাম। মূর্তিটি আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এ ঘটনা দ্বারা আমার দৃষ্টি খুলে গেল। এই ভাঙ্গা শিবের মূর্তিকে লাথি মারলাম। বললাম তুই নিজেই নিজেকে হেফাজত করতে পারলি না, আমার উপকার করবি কিভাবে। আমার মন সাক্ষী দিল– মুসলমানদের ধর্মই সত্য। তাদের খোদা ভাঙ্গেও না ফাটেও না। বাস, একের বিশ্বাস করে নিচ্ছি। আমি অনিচ্ছায় মসজিদে ঢুকে গেলাম।

আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, আমার তো বুঝে এসেছে, ধর্মতো মুসলমানেরটাই সত্য। আমাকে আপনি মুসলমান বানিয়ে দিন। ইমাম সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। আমি বললাম– আপনি ভয় করবেন না, আমি ভালোভাবে বুঝে গেছি যে মুসলমানদের খোদাই সত্য। আমার পীড়াপিড়িতে তিনি আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আমার স্ত্রীকে বুঝিয়েছি, তারও বুঝে এসেছে। আরো একজন ভাইও ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ হলো তৃতীয় নাম্বার ভাই যাকে আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এটাই সত্য, তিনি যখন হেদায়াত দিতে চান, মূর্তিকে দিয়েই বলান যে, আমি ইবাদতের যোগ্য নই। পূজাও বন্দেগির উপযুক্ত শুধুমাত্র আল্লাহই। তাই দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজের জন্য তিনি কারো মুখাপেক্ষি নয়। আমরাই মুখাপেক্ষি। দাওয়াতি কাজ করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আমরা যদি না করি তাহলে আল্লাহর দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে না, আল্লাহ অন্য কোনো

জাতিকে এই কাজের জন্য দাঁড় করিয়ে দিবেন। তাদের দ্বারা এই কাজ নিবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ - ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

অর্থ : যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদের মত হইবে না।-সূরা মুহাম্মদ-৩৮

এটা জাতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তো নয় ?

আপনি পত্র-পত্রিকা পড়ুন। পৃথিবী ভ্রমণ করুন। তাহলে আপনি দেখবেন দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। বাবরী মসজিদ শহীদকারী মুসলমান হচ্ছে। বড় বড় দার্শনিক, খেলোয়ার, রাজকুমার, রাজকন্যা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। এটা তো খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু এর উল্টো দিকটা যদি দেখা যায়, তাহলে দেখবেন– হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মান্তর ছড়িয়ে পড়ছে। মুসলমানরা খ্রিস্টান হচ্ছে। শুধু দিল্লীতে অনেক মানুষ খ্রিস্টান হয়েছে। পুরো দেশে কত মানুষ কাদিয়ানী আর বাহায়ী হচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে মানুষ খুব দ্রুতবেগে খ্রিস্টান হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, মালোয়শিয়াতেও অনেক মানুষ মুরতাদ হচ্ছে। দ্রুতগতিতে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ, আর মুসলমানদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার খবর মিলিয়ে দেখলে মন অস্থির হয়ে যায়। এমন তো নয় আল্লাহ তায়ালা তার অমুখাপেক্ষিতার শান দেখে জাতির পরিবর্তন করছেন (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً)-এর প্রতীক তো বানাচ্ছেন না ?

দাওয়াতি কাজ ছেড়ে দেয়ার অপরাধে যদি এমনটি হয় তাহলে তা শতভাগ সঠিক এবং ইনসাফের কথাও তাই।

আপনি যদি কাউকে কিছু মূল্যবান জিনিস দিয়ে বলেন, এগুলো যেন তার প্রাপ্ত লোকদের কাছে বণ্টন করে দেয়। কিন্তু এই মূল্যবান বস্তুগুলো যদি মানুষের কাছে না পৌঁছায়, নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে তাহলে সেই বস্তুগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আসল অবস্থায় থাকবে না। তখন অপারগ হয়ে আপনি তার থেকে ওই বস্তু ফেরত নিয়ে নিবেন এবং তা অন্য এমন কাউকে দিবেন, যে এই বস্তুটি সঠিকভাবে পরিবেশন করবে। সুন্দরভাবে

মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে। আপনার বাসনা পূর্ণ করতে পারবে।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ

অর্থ: আমিতো বণ্টনকারী, আর আল্লাহ হলেন দাতা। তিনি একথা বলেননি, আমি জমাকারী এবং আমি হলাম মালিক। বরং তিনি বলেছেন, আমি বণ্টনকারী। বণ্টনকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক অনুসারী এবং নবীর ওয়ারিসদের জন্য জরুরি, তারা যেন প্রত্যেকেই বণ্টনের হক আদায় করে।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, যেখানে আমরা অন্যের কাছে বণ্টন করব, পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব সেখানে আমরা নিজের রূপ পরিবর্তন করে ফেলেছি। কিছু নিয়ম-নীতির নাম রেখে দিয়েছি ইসলাম। দুনিয়ার মানুষ কি জানে কুরআন হাদিসের ইসলাম কী ? তারা তো মুসলমানদের বাস্তব জীবনকে ইসলাম মনে করে।

আমাদের মেজাজ

আমাদের মেজাজটাই এমন হয়ে গেছে যে, ইসলামের যেই জিনিসটা আমাদের সামাজিক কৃষ্টি-কালচারের সাথে এবং মনের সাথে মিলে সেটাকে মানি বা গ্রহণ করি। আর যেই জিনিস আমাদের মন আর সামাজিক নিয়ম-নীতির সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যার উপর আমল করা কঠিন, চাই সেটা ইসলামের যতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোক না কেন বাস্তব জীবনে তা থেকে আমরা অনেক দূরে থাকি। পক্ষান্তরে আমাদের থেকে দ্বীনের চাওয়া হলো –

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।-বাকারা -২০৮

দ্বীনের কিছু জিনিসকে মানা, আর কিছু জিনিসকে অস্বীকার করা পবিত্র ইসলাম ধর্মের মেজাজের পরিপন্থি। এটা তো ইহুদিদের মেজাজ। এ বিষয়ে কুরআন দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনার কথা শুনিয়েছে। ইহুদিদের উদ্দেশ্য করে কুরআন একথা বলেছে কিন্তু আজ মুসলমানরা এর মুখাতাব হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .

অর্থ: তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

-সূরা বাকারা-৮৫

এই মেজাজের শাস্তি হলো দুনিয়া ও আখেরাতের অপমান। কিছু কথা মানা আর কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আবার দ্বীনের হুকুম ও শব্দাবলীকে নিজের মনমতো ব্যবহার করা এটা হলো ইহুদিদের মেজাজ। এব্যাপারে ইঙ্গিত করে কুরআন বলে–

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوْا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃতি হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোনো না কোনো প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন।

-সূরা মায়েদা -১৩

ইসলামের সকল পরিভাষা ও বিধানাবলী এই দৃষ্টিতে বুঝে আমল করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে থেকে যেই ভাবে বুঝে ও আমল করেছেন ইসলামের প্রথম জামাত সাহাবায়ে কেরাম। ইসলামকে সব ধরনের বিকৃতি থেকে নিরাপদ রাখা খুবই জরুরি। আমরা যদি এর খেয়াল না রাখি, তাহলে অধিকাংশ সুযোগ সন্ধানী এবং সহজ পছন্দের কারণে। আমরাও يحرفون الكم عن مواضعه এর অভিশাপের আওতায় পড়ে যাব। নিজের ইচ্ছা ও মেজাজ অনুযায়ী যদি দ্বীনের

বিধানাবলী ও পরিভাষা ব্যবহার করি তাহলে সেটা আর থাকবে না। বরং একটি নতুন ধর্মে পরিণত হয়ে যাবে। ইসলামকে এমন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের মানুষগণ বুঝেছেন। এর উপর ঐভাবে আমল করে দ্বীনকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচানো কতটা প্রয়োজন, তা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝে আসবে।

উদাহরণ স্বরূপ একটি শব্দ 'মেরেছে' এই শব্দটা কয়েক ভাবে ব্যবহার করা হয়। একজন সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে অন্য এক সৈনিককে মেরেছে। অপর দিকে মা তার সন্তানকে মেরেছে। এই দুই কথার মধ্যে বর্ণনার ব্যবধান যথেষ্ট রয়েছে। এখন যদি মা'র মারা শব্দটিকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে কী ধরনের ভুল হবে? এমনভাবে দাওয়াত, জিহাদ, শাহাদাত, ভ্রাতৃত্ব, নুসরাত ইত্যাদি ইসলামের পরিভাষাগুলো স্বস্থানে বিদ্যমান রাখার জন্য এর উপর আমল করা খুবই জরুরি। ইসলামের আমলের বিষয় কুরআন সুন্নাহ ও সীরাত থেকে সরাসরি বুঝে তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। সাথে সাথে সরাসরি সীরাত থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা তৈরি করা।

ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও একটি উদাহরণ

আমাদের অবস্থা হলো এই, আমাদের পরিবার ও সমাজে প্রচলিত দ্বীনের কয়েকটি বিষয়ের উপর আমল করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। ধর্মের কিছু অংশকে পরিপূর্ণ ধর্ম মনে করছি। আমাদের উদাহরণ ওই অন্ধ ব্যক্তির মতো। অন্ধদের একবার হাতি দেখার শখ হলো, তারা হাতি দেখতে গেলো। চোখে দেখে এমন ব্যক্তিকে গিয়ে বলল, আমাদেরকে হাতি দেখিয়ে দিন। তারা তো অন্ধ, হাতি দেখবে কিভাবে? সেই ব্যক্তি একজনের হাত ধরে হাতির শুঁড় ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা হাতি। দ্বিতীয় জনকে হাতির লেজ ধরিয়ে বলল এটা হাতি। তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতির কান ধরিয়ে বলল এটা হাতি। এমনিভাবে চতুর্থ ব্যক্তিকে হাতির পা ধরিয়ে বলল এটা হাতি। সবাই খুশি হয়ে গেলো। ফিরে গেলো নিজ গ্রামে। লোকজন জিজ্ঞাস করল, তোমরা কি হাতি দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সকলেই হাতি দেখেছি। লোকজন জানতে চাইল তোমাদের কাছে হাতি দেখতে কেমন মনে হলো? যে অন্ধ হাতির শুঁড় ধরেছিল সে বলল হাতি হলো পেঁপে গাছের মতো। যে লেজ ধরেছিল, সে বলল, হাতি হলো ঝাড়ুর মতো। যে পা ধরেছিল সে বলল, হাতি হলো মোটা গাছের মতো। যে হাতির কান ধরেছিল সে বলল,

হাতি হলো কুলার মতো। এমনভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা ও জ্ঞানের কথা বলে দিল। কিন্তু হাতির বড় কোনো অংশের স্পর্শও করতে পারেনি।

কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান না থাকার দরুন, এই অন্ধদের মতো দ্বীনের প্রচলিত কিছু আমলকে দ্বীনের পূর্ণ অংশ মনে করছি। এমনিভাবে আমরা ঈমানী ও আমলী দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। ফলে কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে পুরো দ্বীনকে বুঝতে ও আমল করতে অক্ষম। সেই রবের উপর কুরবান যিনি এই অংশ থেকে মুক্তির জন্য এলান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অর্থ: যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা।

-আহযাব-২১

নববী কাজ ও চরিত্রের সাথে সম্পর্ক খুবই জরুরি

কুরআন ও সুন্নাহ এই দুটো জিনিসই হলো আসল দ্বীন। অর্থাৎ কুরআন হলো দ্বীনের লিখিত রূপ। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত হলো বাস্তব ব্যবহারিক আমলী রূপ।

এক বর্ণনা অনুযায়ী কুরআনে পাকের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী ৬২৩২টি। এর মধ্যে ৫০০ আয়াত বিধি-বিধানাবলী আমল ও মাসায়েল সম্পর্কীত। অন্যান্য ৬০০০ আয়াত দাওয়াত ও তার চূড়ান্ত জিহাদ (জিহাদের বিধানাবলী, সে সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঘটনাসমুহ) বিষয়ে। কুরআনে হাকিমের এই সম্পর্ক সীরাতের মধ্যেও বিদ্যমান। দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া, বাকি আহকামাতের আয়াতের উপর আমল করছি। তার উদাহরণ হলো ওই দর্জির ন্যায়, যাকে একটি জামা সেলাই করতে দেয়া হলো। সেই দর্জি জামার হাতা না বানিয়ে শুধু কলার ও জামার সামনের অংশ বানিয়ে নিয়ে এলো। আর বলতে লাগল নিন আপনার জামা। আপনার জামা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এমন কোনো বেকুফ মানুষ আছে কি? যিনি এই আধুরা জামাটা গ্রহণ করবে? নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে আদর্শ বানানোর জন্য, সকল কাজ, অভ্যাস, কথাবার্তা, চরিত্র, সকল দিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের

মতো হতে হবে। এর জন্য দাওয়াতের কাজ এবং তার পূর্ণতা জিহাদের গুরুত্ব দেয়া উচিত। সীরাতের অধ্যয়নকারী তা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এমন কি দাওয়াতি কাজে, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধের পদ্ধতিও পবিত্র সীরাত অনুযায়ী হতে হবে। এখানে এ কথাটি স্পষ্ট করা ভালো হবে, উত্তম জিনিসগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস হলো 'ঈমান'। অসৎ জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ হলো কুফর ও শিরক। তাই ঈমানের দাওয়াত, কুফর ও শিরক থেকে মানুষকে বাধা দেয়া এবং তা থেকে বের করে আনা, সকল কাজের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রথমে কাদের সংশোধন: মুসলমানদের না মুশরিকদের

এ ব্যাপারে আমাদের নফস আমাদেরকে একটি অজুহাত শিক্ষা দেয়। প্রথমে যদি আমাদের নিজেদের সংশোধন হয়ে যায়, আর আমরা নামের মুসলমান যদি কাজের মুসলমান হয়ে যাই, এরপর অন্যের খবর নিব। সত্যিই কথাটি খুবই যুক্তিসংগত চমকপ্রদ মনে হয়। এর মধ্যে নিজেদের সংশোধনের চিন্তা বেশি অনুভব হয়। কিন্তু একটু ভালোভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা নফসের একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই বিষয়ে কয়েকটি কথার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি অনেক উপকার হবে। প্রথমত: আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনে হাকিম থেকে কি এই পদ্ধতি ও চিন্তা বুঝে আসে? দ্বিতীয়ত: এই ভাবে আমল করার জন্য কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ বানিয়েছেন? তৃতীয়ত: সাহাবায়ে কেরাম যারা দ্বীন বুঝার প্রথম জামাত ছিলেন। যারা সরাসরি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধন প্রাপ্ত লোক ছিলেন। তাঁদের কি এই মেজাজ, মানসিকতা ছিল। যে, প্রথমে আমরা জেনে নিই, মেনে নিই, তারপর অন্য মানুষকে দাওয়াত দিবো? এমন ছিল কি সাহাবাগণের চিন্তাধারা? আমাদের সরদারের হুকুম بلغوا عني و لو اية (একটি বাক্য হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও) এর উপর আমল করতেন। তাঁরা যা কিছুই জানতে পেরেছেন তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ওই সব জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল ঈমান।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা যদি এই অপেক্ষায় থাকি যে, যখন আমরা পূর্ণ সংশোধন হয়ে যাব। শতভাগ ইসলামের উপর চলব ও পাক্কা মুসলমান হব। তারপর দাওয়াত দিব। এমন সময় কখনও আসবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خير القروني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

অর্থ : সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, অতঃপর তার পরের যুগ, তারপর তার পরের যুগ। এই হাদিস অনুযায়ী দেখতে পাই মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে দোষ বাড়ছে, আর ভালো কমছে। পুরো জীবনে শতভাগ মুসলমান হওয়ার সুযোগ নেই। তাই আমাদের দাওয়াতের কাজকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর কুরআন-হাদিস ও সীরাত অনুযায়ী ঈমানের আমল করতে হবে।

কালেমায়ে শাহাদাত একটি অঙ্গীকার

প্রত্যেক ঈমানদারগণ জানে, কালেমা তায়্যেবার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এ কালেমাকে মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান। কালেমা তায়্যেবার কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলাকে কালেমা শাহাদাত বলে। যারা নতুন ঈমান গ্রহণ করে, তাদের কালেমা তায়্যেবার স্থলে কালেমা শাহাদাত পড়ানোই সুন্নাত। এই কালেমা দ্বারা মানুষ সাক্ষী দেয় যে আমি সত্য দিলে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং ঘোষণা দিই যে, আল্লাহ ছাড়া এবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যুদাতা, আহারদাতা, উপকার ও ক্ষতি, সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ। আমি অঙ্গীকার করছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কাউকেই উপাস্য হিসেবে, আহারদাতা, পালনকর্তা, কোনো উপকার-ক্ষতির মালিক প্রকৃত বিচারক এবং অন্তরে স্থান দেয়ার মতো উপযুক্ত কাউকে মনে করব না। আমি তার বান্দা ও গোলাম-দাস থাকব। আমি এই ঘোষণা করছি ও সাক্ষী দিচ্ছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ গোলামির ক্ষেত্রে সফল বান্দা ও সত্য রাসূল। আমি সত্য মনে এ কথার অঙ্গীকার করছি যে, আল্লাহর দেয়া জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করব। তাঁর সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাপন করার জন্য বাস্তব আদর্শ বানিয়ে নেব। কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে দুটি অংশ। একটি হলো–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

আর দ্বিতীয়টি হলো–

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

প্রথম অংশকে এখলাস ও নিষ্ঠার কথা বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র তাঁরই জন্য জীবিত থাকব। তারই জন্য মৃত্যুবরণ করব। এবং যা কিছু করব তা শুধু তার জন্যই করব। অন্তরের মধ্যে শুধু তাঁকেই স্থান দিব। এর জন্য

প্রয়োজন অধিক এখলাস। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্মান, বড়ত্ব, গাইরুল্লাহর দাসত্ব ও ভালোবাসা অন্তর থেকে বের করে দিব। তাই এই কালেমার মধ্যে প্রথম অংশটি নেতিবাচক এরপর ইতিবাচক অঙ্গীকার করা হয়েছে। কালেমার দ্বিতীয় অংশ হলো

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অংশকে আনুগত্যের অঙ্গীকার বলা যেতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের পুরো জীবনে শতভাগ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করব। সেই আনুগত্যের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের আনুগত্য করব। তাঁর রেসালাতেরও আনুগত্য করব। এখানে তাই সুস্পষ্ট করে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে–

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমার সম্মানিত মুরশিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)ও দাসত্ব রেসালাতের বিষয়ে কত সুন্দর একটি কথা বলেছেন। দাসত্বের অনুসরণের বাস্তব প্রতীক হলো দু'আ। তাই সকল ইবাদতের জন্য মূল হলো দু'আ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের বাস্তব প্রকাশ হলো দাওয়াত। এখানে একটি জিনিস জানা খুবই জরুরি।

الايمان ما وهو في القلب بصورة العمل

ঈমান হলো ওই জিনিস, যা অন্তরে বসে যায়। আর আমল যা সাক্ষী দেয়। এটা বাস্তব সত্য, যেই জিনিসের বিশ্বাস মানুষের অন্তরে হয় সেই অনুযায়ীই সে আমল করে। উদাহরণস্বরূপ আপনি রাতের বেলায় একাকী একটি পথে চলেছেন। আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একজন ব্যক্তি অপর দিক থেকে এসে বলল, এই পথে ডাকাতদের একটি গ্রুপ লুটপাট করছে। অনেক মানুষকে হত্যাও করছে। আপনি যদি তাঁর কথায় বিশ্বাস করেন, তাঁর উপর আস্থা রাখেন, তাহলে কখনোই সেই পথে যাবেন না। এত কিছু জানার পরও যদি সেই পথে চলেন তাহলে মানুষ বলবে যে, তাঁর উপর আপনার কোনো আস্থা নেই। তাঁর কথা আপনি বিশ্বাস করেননি। কারণ আপনার কাজ আপনার বিশ্বাসকে সত্যায়িত করেনি। ঠিক এমনিভাবে ঈমানের সাথে আমালে সালেহা অর্থাৎ ঈমানের সাথে ঈমানের সত্যায়িত আমলও জরুরি। তাই বলা হয়েছে ঈমান হলো ওই জিনিস, যা অন্তরে বসে যায়। আর তাঁর আমল সেই ঈমানকে সত্যায়িত করে।

ভালো কাজকে পছন্দ করাই যথেষ্ট নয়

কোনো ভালো কাজকে পছন্দ করা আর সমর্থন করাকেই আমরা যথেষ্ট মনে করি। কোনো কাজকে পছন্দ ও সমর্থনেই যদি যথেষ্ট হতো, তাহলে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা আবু তালেবের বেলায় বেশি কাজে আসত। কারণ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় সহযোগী। দ্বীন ও দ্বীনদারদের মন থেকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তার এই পছন্দ ও সহযোগিতা কোনো কাজে আসেনি। এ জন্য কালেমায়ে শাহাদাত তথা এখলাসের অঙ্গীকার। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মৌখিক ও আন্তরিক অঙ্গীকারের সাথে সাথে, কার্যত সত্যায়ন অতীব জরুরি।

পূর্ণ ঈমানের নাম হলো কালেমায়ে শাহাদাতের উপর কার্যত সত্যায়ন ও বিশ্বাস স্থাপন। কেউ যদি নিষ্ঠার সাথে ইবাদাত ও সাধনা করে, অন্তরেও থাকে পরিপূর্ণ এখলাস, কিন্তু সে নবীর দাওয়াতি কাজের আনুগত্য করে না, দাওয়াত দেয় না, দাওয়াতি কাজকে শুধু পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে সে পরিপূর্ণভাবে ঈমান গ্রহণ করেনি। কেননা সে দাসত্বের অঙ্গীকার তো পূর্ণ করেছে। কিন্তু রিসালাতের অঙ্গীকার প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা দাওয়াত হলো ঈমানের অংশ দাওয়াত ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ। বাস্তব সত্য হলো, দাওয়াত ছাড়া ইখলাসও পরিপূর্ণ নয়। যে নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করে, কিন্তু দাওয়াতি কাজ করে না, তাহলে সে পূর্ণ মুখলেস ও নিষ্ঠাবান হতে পারবে না। এখলাস হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে জীবনযাপন করা। আল্লাহর রাজির জন্য জীবনযাপন করতে হলে, তার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শতভাগ আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা পাওয়ার আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

অর্থ: বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্‌ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

-আলে ইমরান- ৩১

নবীজীর দাওয়াতি ব্যথায় জানবাজী দেয়া ছাড়া নবীর এত্তেবা কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ দাওয়াত ছাড়া এখলাসও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের এসলাহের ফিকির ও নিজ ঈমানের জিম্মাদারী আদায় করার জন্য ঈমানের দাওয়াতের হক আদায় করা খুবই জরুরি।

দাওয়াতি কাজ ঈমানী দায়িত্ব ঃ তারই একটি দিক

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– আমানত এবং ওয়াদা পূর্ণ করা ঈমানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لايمان لمن لا امانة له و لادين لمن لاعهدله

: যার আমানতদারী নেই তার ঈমান অসম্পূর্ণ। যে ওয়াদা পূর্ণ করে না তার দ্বীন অসম্পূর্ণ। অন্য এক বর্ণনায় মুনাফিকের তিনটি আলামত বর্ণনা করা হয়েছে।

اية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذاحدث كذب واذا أوتمن خان و رواية واذاعهد نسخ -

অর্থ: মুনাফিকের আলামত তিনটি। ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। কথা বলার সময় মিথ্যা বলে। তার কাছে যদি কেউ আমানত রাখে, তা খেয়ানত করে। অন্য এক বর্ণনায় যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। আমরা কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে একটি অঙ্গীকার করেছি। আমাদের এই যে সত্য তা প্রকাশ করার জন্য আমলের দ্বারা তার বাস্তবতা পেশ করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে নিষ্ঠা, দাসত্ব ও রেসালতের অনুসরণের খেয়াল করেছি কি না?

দ্বিতীয় বিষয় হলো আমানতদারী। আমানতের হক আদায় করা ছাড়া ঈমানদার হওয়া যাবে না। আমাদের হক আদায় করা এবং খেয়ানত থেকে বাঁচার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম আমানতের তিনটি হক নির্দিষ্ট করেছেন।

আমানতের হক ৩টি

এক. সাধ্যানুযায়ী আমানতের হেফাজত করা। এটা ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি। সাধ্যানুযায়ী আমানতের হক আদায় না করার কারণে আমানত যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমানতদাতাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

দুই. আমানতের দ্বিতীয় হক হলো, আমানতের মাল খরচ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। আমানতের মালের মধ্যে কম-বেশি করারও অনুমতি নেই। এমনকি মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতকৃত টাকা পরিবর্তনও করা জায়েজ হবে না।

তৃতীয়. আমানতের তৃতীয় হক হলো, মালিক যখনই তার মাল ফেরত চাবে, অথবা অন্য কাউকে দেয়ার জন্য বলবে, তখনই কোনো ধরনের কম-বেশি ও আপত্তি ছাড়াই তার মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে। মোটকথা প্রত্যেক আমানতের ব্যাপারে এই মূলনীতি বুঝা গেল। এই তিনটি হক আদায়কারীকে আমানতদার বলা হবে। অন্যথায় তাকে বলা হবে খেয়ানতকারী, আর এই খেয়ানত মুনাফিকের একটি আলামত।

ঈমানও একটি আমানত

কুরআনে কারিমে একটি বড় আমানতের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ۝

অর্থ : আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালেম, অজ্ঞ। যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।-সূরা আহযাব -৭২-৭৩

কুরআনে কারিমের বর্ণিত এই আমানত সম্পর্কে জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হলো, এই আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমান এবং পবিত্র ধর্ম ইসলাম। যার হক আদায় করতে আসমান-জমিন ও পাহাড়ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। অতএব, এই ঈমান হলো: এক মহান আমানত, যা আমাদেরকে আমানত হিসেবে দান করা হয়েছে। ঈমানদারী প্রকাশ করা আর মুনাফিকের আলামত থেকে বাঁচার জন্য এই আমানতের হক আদায় করা। এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজ ধর্ম এবং ঈমানের হেফাজত করা। এর মধ্যে দ্বীন এবং সকল জিনিসের হেফাজতও অন্তর্ভুক্ত। আবার তাকে কুসংস্কার থেকে রক্ষা করাও জরুরি। অর্থাৎ যে জিনিস দ্বীন নয় ওই জিনিসকে দ্বীন মনে করা (বেদআত থেকে বাঁচানো) এবং যেই জিনিস দ্বীন এবং ঈমানের অংশ তাকে ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এই

জন্য-

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفِرُ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ আমরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনি, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করি। এ ধরনের চিন্তাধারাও খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় দায়িত্ব হলো ব্যক্তিগতভাবে এই ঈমানকে কবর পর্যন্ত পৌঁছানো। যাতে ওই ঈমানকে আল্লাহর সামনে পেশ করতে পারে। দ্বীনকে ওই সমস্ত লোকদের কাছে পৌঁছানো জরুরি, যারা তার হকদার এবং যাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর হুকুম দেয়া হয়েছে,

بلغوا عني ولو آية

আমার পক্ষে থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও। দ্বীনের প্রত্যেকটি বার্তাকে ওই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানো ফরজ, যার পর্যন্ত এ কথা পৌঁছেনি। এটা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। এই তিনটি হক আদায় করা ছাড়া আমানতদার হতে পারবো না। মানুষ খেয়ানতকারী বলবে। খেয়ানত হলো মুনাফিকের আলামত। তাই উপরোক্ত আয়াতে মুশরিক পুরুষ মুশরিক মহিলাদের আলোচনার পূর্বে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে। কারণ মুনাফিকরাও আল্লাহর নিকট মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ: নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সবচাইতে নিচের স্থানে যাবে। এইটা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বাহ্যত সে নিজকে মুমিন বলে। এই জন্য মুশরিকদের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে। আর স্পষ্টভাবে মুশরিকদের আলোচনার পরে করা হয়েছে। এই আমনতের ভার মানুষকে প্রদানের উদ্দেশ্য হল যাতে করে আমানতদার ও খেয়ানতদার শনাক্ত হয়ে যায়। কে মুমিন, মুনাফিক, আর মুশরিক তা যেন চেনা যায়। ফলশ্রুতিতে মুমিন তার আমানতের হক আদায় করার জন্য বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হবে। আর মুনাফিক ও মুশরিকদেরকে আমানতের হক আদায় না করায় শাস্তি দেয়া হবে।

এই জন্য কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে যে ওয়াদা ও এখলাসের অঙ্গীকার করেছি, দাসত্বের অনুসরণ রেসালাতের এত্তেবার যেই ওয়াদা করেছি তা পূরণ করা। দাওয়াত ছাড়া এবং মানুষের কাছে তাওহিদের বাণী পৌঁছানো ব্যতিত অসম্ভব। মোটকথা আমানতদারী, সত্য কথা বলা, ওয়াদা পূরণ করা

এবং ঈমানের অন্যান্য শর্তসমূহ পূরণ করার জন্য ঈমানের দাওয়াত দেয়া খুবই জরুরি। এই কাজ আদায় করা ছাড়া মিথ্যা কথা বলা খেয়ানতদারী। ওয়াদাখেলাপি এইসব মুনাফিকের আলামতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার সমুহ সম্ভাবনা আছে। তার প্রতিফলন,

في الدرك الاسفل من النار

জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের জায়গা। (এর শাস্তির চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্ভাবনা রয়েছে।)

দাওয়াতি কাজ নিজের ঈমানের জন্যও জরুরি

নিজের আত্মশুদ্ধি এবং অন্তরে ঈমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য, এর থেকে সহজ পথ আর কিছুই হতে পারে না। অন্যকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া, মানুষের মানবিক দুর্বলতা। বরং এক দিক থেকে মানবিক সৌন্দর্যও বটে। তা হলো যখন মানুষ কাউকে কোনো ভালো কাজের দাওয়াত দেয় তখন সেই ভালো কাজটি তার নিজের মধ্যে এসে যায়। আর যখন কোনো খারাপ কাজ থেকে মানুষ বাধা দেয়, তখন সে নিজেও ওই খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। তার নিজের জন্য ওই মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (যিনি সেই সময়ের মুজাদ্দিদ ছিলেন) তিনি বলতেন, যখন নিজের মধ্যে কোনো জিনিসের দুর্বলতা অনুভব হয় তখন ওই বিষয়ে দুই চার জায়গায় ওয়াজ করে নেওয়া। তাহলে সেই দুর্বলতা পূরণ হয়ে যাবে। এই কথা একেবারে স্পষ্ট যে, যদি কেউ নিজের ঈমানকে অটল রাখতে চায়, তাহলে তার জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, ঈমানের দাওয়াত দেয়া। একজন মানুষের স্বভাবজাত ও মানসিক একটি দুর্বলতা হলো এই, তার উপরে সংস্রব-ছোহবতের প্রভাব পড়ে। সে যেই পরিবেশে, যেই স্থানে যেই অবস্থায় জীবন-যাপন করে, সেই পরিবেশের ভালো মন্দ প্রভাব থেকে সে বাঁচতে পারে না। সংস্পর্শের বা ছোহবতের প্রভাবের বাস্তবতা এমন সত্য। তা কখনও আস্বীকার করা যাবে না। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রামাণিত, পশু-পাখি ও গাছ পালার সংস্পর্শও মানুষকে প্রভাবিত করে। যে অঞ্চলে কাটাযুক্ত গাছ বেশি, যেমন বাবলা গাছ ইত্যাদি, সেখানকার মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস কঠিন হয়ে থাকে। যেসব অঞ্চলে ফলযুক্ত গাছ-পালা বেশি থাকে, ওখানকার মানুষের মধ্যে

বিনয় ও তাওয়াজু পাওয়া যায়, এমনিভাবে পশু পাখির সংস্পর্শও অনেক প্রভাবিত করে। আমার সহজ-সরল এক বন্ধুর কথা মনে হলো। তার কাছ থেকে দ্বীনের ব্যাপারে হেকমতপূর্ণ একটি কথা জানতে পারি। কোনো এক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়, তা মীমাংসার জন্য এক মিটিংয়ে ওই বন্ধু উপস্থিত ছিল। দায়িত্বশীলগণ কোনো সমঝোতায় আসছিল না। সকল চেষ্টা ভেস্তে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে একজন হাফেজ সাহেব কেঁদে উঠলেন। আর বলতে লাগলেন– আমরা হলাম দ্বীনের ঠিকাদার। আমাদের অবস্থা হলো কুকুরের মতো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন? সে বলল, একটি মহিষ বা গরু যদি মারা যায়। সেই মৃত গরুটি একটি কুকুর খাচ্ছে। এমন সময় যদি অন্য একটি কুকুর চলে আসে, তাহলে সে তার খাওয়ার কথা ভুলে যাবে। আর তাকে ভাগিয়ে দেয়ার জন্য যুদ্ধ করবে। চাই সে নিজের জীবন দিয়ে দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকে ভাগিয়ে দিবে। চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে শান্তিতে বসতে পারবে না। আমি তাকে বললাম, তাহলে আমাদের কেমন হওয়া উচিত? সে বলল, ছাগলের মতো। আপনি যদি তার সামনে কিছু ঘাস বা খাবার দিয়ে দেন, সেখানে একটি ছাগলের পালও যদি ছেড়ে দেন। তাহলে তারা পরস্পর মারামারি করবে না। সকলেই মিলে এক একটি পাতা শেষ করে দিবে।

তার একথা থেকে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। কত সুন্দর হেকমতপূর্ণ কথা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এল, ইসলামে কুকুর পালা নিষেধ করা হয়েছে। আর ছাগল প্রতিপালন করা সুন্নাত বলা হয়েছে। অনেক হেকমত থাকা সত্যেও এটিও একটি কারণ। ছাগলের সংস্পর্শে মানুষের মধ্যে মহব্বত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর কুকুর ভালোবাসা দূর করে। হিংসা ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ আমাদের এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

এখলাসের মাপকাঠি

এখানে আমার শায়েখ মুরশিদ, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) থেকে আমি বার বার হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহিদ (রহ.)-এর একটি বাণী তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। আর সেই বাণী আমি পাঠকদের কাছে পেশ করতে চাই। সাইয়্যেদ আহমদ শহিদ (রহ.) বলতেন, এখলাস ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর এখলাসের মাপকাঠি আপনাকে বলে দিচ্ছি। নিজের আমলের এখলাসকে ওজন দিন। তিনি বলেন দ্বীনের যে কোনো লাইনের কর্মীর কাজকে নিজের উপর

এহসান মনে করবে। সাইয়্যেদ আহমদ শহিদ (রহ.) বলেন, যদি দ্বীনের প্রত্যেকটি কর্মীর অনুগ্রহ যদি অন্তরের মধ্যে থাকে তাহলে বুঝা যাবে যে, তার মধ্যে এখলাস আছে। যদি এহসানমন্দী অর্থাৎ অনুগ্রহের জায়গায় হিংসা সৃষ্টি হয়, অথবা এই প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, সে কেন কাজ করছে? অথবা তার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। অথবা এই ধরনের চিন্তা হয় যে, আমিই তো সবকিছু করছি। অন্যরা কোন কিছুই করছে না। যদি এমন মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে কোনো এখলাস নেই। এমতাবস্থায় তার জন্য উচিত সে তার নিয়তের এসলাহ করবে। অন্যথায় কাজ বন্ধ করে দিবে।

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী (রহ.) এই বাণীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– এখলাস হলো আল্লাহর মহব্বতের নাম। আল্লাহর সাথে যদি মহব্বত থাকে, তাহলে আল্লাহর দ্বীনের সাথেও মহব্বত থাকবে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে মহব্বত থাকার আলামত হলো দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজকে নিজের দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত কর্ম মনে করবে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.)-এর খেদমতে দিল্লির একজন ব্যবসায়ী উপস্থিত হলেন। সাথে কিছু হাদিয়াও পেশ করলেন। বললেন, হযরত! এইগুলো আপনার ব্যক্তিগত কাজে খরচ করবেন। হযরত অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ভাই! আমরা যদি দ্বীনের কাজকে নিজের ব্যক্তিগত কাজ মনে না করি, তাহলে তো দ্বীন বুলন্দ হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি মুখলিস হয়, নিষ্ঠাবান হয়, তাহলে দ্বীনের প্রতিটি কাজকে তার নিজের কাজ মনে করবে। যদি কোনো মানুষ কারো ব্যক্তিগত কাজটি করে দেয়, বা তার কাজের সহযোগিতা করে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে ওই সহযোগিতার অনুগ্রহকে সে মূল্যায়ন করবে। তার সম্মান তার অন্তরে স্থান পাবে। যদি প্রতিটি আমলকে এই ধরনের মাপে তোলা হয়, আর এই ধরনের মাপের অভ্যাস করানো হয়। তাহলে দ্বীনদারদের অনেক ঝগড়া শেষ হয়ে যাবে। পরস্পর অনেক ত্রুটি দূর হয়ে যাবে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, এখতেলাফ ও মতানৈক্যের মাধ্যমে, ভালোবাসা, ঘৃণা, নেকি আর বদি, ভালো আর মন্দ, সবকিছুর প্রভাব মানুষের মধ্যে এমনভাবে পড়ে যার বাস্তবতা শুধু দ্বীনদাররাই নয়, দুনিয়াদাররাও স্বীকার করে। আমরা যেই পরিবেশে থাকি, যদি আমরা এই কুফর ও শিরক দূর না করি, ঈমানি পরিবেশ করার চেষ্টা না করি, কুফর এবং শিরকের সাথে যদি মিশে যাই। তাহলে কোনো উপায়

থাকবে না। এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি। ঈমানের দাওয়াত অর্থাৎ নিজের পরিবেশকে কুফর এবং শিরক থেকে পবিত্র রাখা আমাদের ঈমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি। আর এর সহজ পদ্ধতি হলো দাওয়াত। এই দাওয়াত ছাড়া সকল ভালো কাজ এবাদত ইত্যাদি যা কিছু আছে সবকিছু অসম্পূর্ণ।

দাওয়াতি কাজ আবেদদের জন্য নাজাতের পথ

জ্বিন এবং মানব জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর দাসত্ব ও গোলামি করার জন্য বলেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে শুধু আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। -সূরা যারিয়াত-৫৬

বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন গোত্রের ব্যক্তিগত উপাসনাও বন্দেগীর মাপকাঠি এবং তার পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে। এই উপরোক্ত দুইটি আয়াতের সারমর্ম নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায় সাধারণ মানুষ এবং মুসলিম জাতির বন্দেগী, তাঁর দাসত্ব ও ইবাদাত এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য।

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَانِ

-সূরা যারিয়াত ৫৬

আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। এই আয়াতের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য জীবনযাপন করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উত্তম জাতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের জন্য কুরআন পাকে ইরশাদ করেন–

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

অর্থ: তোমরা উত্তম জাতি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে।

-সূরা আলে ইমরান-১১০

সকল মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহ পাকের গোলামি করা। গোলামির সফলতা হলো আল্লাহ পাকের দাসত্ব করা। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার দায়িত্ব

হলো নিজে শতভাগ আল্লাহর দাসত্ব করবে। সাথে সাথে মানুষকে আল্লাহর গোলামি করার পথে নিয়ে আসবে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন: "মুসলমান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মতো। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দুই ধরনের ডিউটি হয়ে থাকে। একটি হলো নিজে পরিপূর্ণভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। দ্বিতীয় জিম্মাদারী হলো সাথে সাথে অন্যদেরকে নিয়ম কানুনের উপর চালাবে। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে যাতে কেউ আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একজন পুলিশ রাজপ্রাসাদে ডিউটি করছে। এমন সময় রাজপ্রাসাদে বাদশাহর পীর সাহেব এলেন। কর্মরত পুলিশ তার ডিউটি ছেড়ে দিয়ে ওই পীর সাহেবের খেদমত করতে আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় তার অধীনস্ত এলাকায় ডাকাতি অথবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটল। এক্ষেত্রে তার পীর সাহেবের খেদমত করা সত্ত্বেও তাকে চাকুরিচ্যুত করা হবে। এমনিভাবে মুসলিম জাতির প্রত্যেকটি জিম্মাদারী হলো, নিজ এলাকায় নিজ এরিয়াতে, নিজের ডিউটি পালন করবে আর নিজের ডিউটি পালন করার সাথে সাথে, মানুষদেরকে সৎ কাজের দাওয়াত দিবে। অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে। আর এই ডিউটি যৌবন থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চালাতে হবে।

থানভী (রহ.)-এর এই কথা দ্বারা একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবাদত, রিয়াযত, চেষ্টা-সাধনার মধ্যে সফলতা ও পূর্ণতা অর্জনকারী ব্যক্তি যদিও বাহ্যতপক্ষে দেখতে মুত্তাকি এবং মুসলমান মনে হয়, কিন্তু নিজের দাওয়াতের জিম্মাদারী থেকে উদাসীন হওয়ার কারণে উল্লেখিত সিপাহির মতো সে সাজা এবং সাস্পেন্সের যোগ্য হবে। মুসলিম জাতির গোলামি আসলে গোলামের ইমামতি করা। আসল কথা এই এবাদতও দাওয়াত ছাড়া পরিপূর্ণ হতে পারে না। নামায এবং জিকির মোনাজাতকে ইবাদত মনে করা যায়। তবে এটাই পরিপূর্ণ ইবাদত নয়। বা এটা পরিপূর্ণ ইবাদত হতে পারে না। কিন্তু ইবাদতের নাম হলো গোলামি দাসত্ব এবং দাসত্বের জীবন-যাপন করা, আল্লাহ পাকের হুকুম মানা। মালিকের পক্ষ থেকে যা হুকুম হবে, তাই পালন করা হলো ইবাদত। কোনো জিনিস থেকে যদি বাধা দেয়া হয় সেই জিনিস ছেড়ে দেয়ার নাম হলো ইবাদত। যে সময় যে হুকুম করা হয় ওই সময় অন্য কোনো কাজ করা বন্দেগী নয়, গোলামি নয়।

আমাদের জীবনের উদাহরণ হলো এমন বাবার ন্যায়, যে তার মেয়েকে একটি জরুরি কাজ করার হুকুম দিল। সে তার বাবার নির্দেশ না মেনে,

আবেগের সাথে পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সাথে তার গুণগান গাইতে লাগল। কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। তার পায়ে পড়ে রইল, আর বাবা বার বার কাজটি করার জন্য হুকুম করছে, প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে আসার জন্য। আর সে আদরের সাথে তার পায়ে পড়ে আছে। প্রকাশ থাকে যে এই ধরনের মুহাব্বত, ভালোবাসাকে নির্দেশ পালন করা বলা যাবে না। এমনিভাবে যখন মহান রাব্বুল আলামিন এই উম্মতকে যেই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন সৎ কাজ করা এবং ভালো কাজের দিকে ডাকা। অসৎ কাজ থেকে নিজে বাঁচা ও অন্যকে বাঁচানো। তাহলে সেটাই হবে আসল ইবাদত বন্দেগী। দাওয়াতের কামই হবে আসল ইবাদত। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেই সকল মাকসাদ ও উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রাখা ছাড়া তার মঞ্জিল এবং নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছা মুশকিল। উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টিকে জমিয়ে রাখতে পারলেই, চায় সে মাকসাদ পূর্ণ হোক অথবা না হোক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যদি কাজের সাথে লেগে থাকে তাহলে সে সফল হবে।

এব্যাপারে একটি ঘটনা মনে হলো, হাদিস শরিফে এসেছে,

الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو احق بها

হেকমত মুমিনের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। ভুলে যাওয়া সম্পদ তা যেখানে পাবে সেখান থেকে সে অর্জন করবে। এজন্য হেকমতের কথা যেখানেই পাওয়া যায়, যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেটাকে মূল্যায়ন করা উচিত।

আমাদের ফুলাতে আখের চাষ হয়। আখ কেটে কেটে সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়। দুই লাইনের মাঝে কিছু অংশ খালি থাকে। ক্ষেতের মাঝে দুই লাইনের মাঝে খালি জায়গাটাকে নরম করা ও আবর্জনা দূর করার জন্য মই দেয়া হয়। একজন মইয়ের মধ্যে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অপর একজন পিছন থেকে গরু বা মহিষ হাঁকাতে থাকে। আখ ক্ষেতে যেতাম। ইচ্ছায় বা সখ করে, আবার কখনো প্রয়োজনেও যেতাম। একবার আখ ক্ষেতে মই দেয়া হচ্ছে। আমি সখ করে ওই দড়িটা ধরে মইয়ের উপরে উঠলাম। নিয়ম হলো দুই পার্শ্বের আখের গাছ যেন না ভাঙ্গে। আমি বার বার ফেল হয়ে গেলাম। গরুকে কন্ট্রোল করতে পারি না। আমার দ্বারা দুই চারটা গাছ ভেঙ্গে যায়। এই অবস্থা দেখে কাজের লোক যে গরুগুলো হাঁকাচ্ছিল, সে গরুগুলো থামিয়ে আমাকে বলল, মিয়া সাহেব! এভাবে নিচের দিকে তাকালে গাছ ভাঙতে থাকবে। আপনি সামনের দিকে দৃষ্টি

দিন। আপনি যেদিকে যাবেন সেদিকে তাকান। তাহলে একটি গাছও নষ্ট হবে না। গরু সোজা চলতে থাকবে। আমি তাই করলাম, তারপর একটি গাছও নষ্ট হলো না।

এ কথা দ্বারা আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা মনে হলো। মানুষ যদি তার সামনের গন্তব্যস্থানের দিকে তাকায়, তার মাকসাদকে সামনে রেখে চলে, তাহলে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছা খুব সহজ হয়ে যাবে। (তার জীবনের উদ্দেশ্য হলো) স্রষ্টার দাসত্ব ও গোলামি করা। ব্যক্তিগতভাবে এটা মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব। আর উম্মত হিসেবে দায়িত্ব হলো দাসত্বের সাথে সাথে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের গলায় এক আল্লার গোলামির মালা পরিয়ে দিবে। তাহলে জীবনে যা করবে তা মাকসাদের জন্য করবে এবং তার প্রতিটি কাজ দাওয়াত হয়ে যাবে। খুব সহজে তার আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশের তৌফিক হবে এবং গোনাহ থেকে সে বেঁচে যাবে। খুব দ্রুত তার ঈমানের উন্নতি হবে।

জিকিরকারীদের জন্য দাওয়াত হল আসল জিকির

আল্লাহর ভালোবাসার নাম হলো ঈমান। আর ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য হলো– হরহামেশা প্রেমিকের স্মরণ হবে। তারকথা আলোচনা করবে। প্রেমিকের আলোচনার দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়। অন্তরের তৃপ্তি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

الذين امنوا وتطمئن قلوبهم

-সূরা রাআদ-২৮

কারো প্রতি যদি কারো ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, সর্বদা তার আলোচনা করতে মন চায়। তার ভালোগুণের যদি আলোচনা না করতে পারে, তাহলে তার ত্রুটির দিক নিয়েই আলোচনা করে। এতে সে অন্তরে তৃপ্তি পায়। রাবেয়া বসরীর কাছে একজন লোক আসত, সে সবসময় দুনিয়ার দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতো। রাবেয়া বসরী রাগান্বিত হয়ে বললেন– তুমি আমার মজলিসে আসবে না কারণ তোমার মধ্যে দুনিয়ার ভালোবাসা রয়েছে। কেননা সর্বদা তুমি দুনিয়ার আলোচনা কর।

প্রেমিকের অপারগতা হলো, তার মাহবুবের আলোচনা ছাড়া প্রশান্তি হতে পারে না। আল্লাহর ভালোবাসার শর্ত হলো ঈমান। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ـ وَاَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ـ

অর্থ : আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে যেমন আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রতক্ষ্য করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিন। -সূরা বাকারা-১৬৫

বরং আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে জিহাদের মহব্বত প্রাধান্য থাকা ফরজ। তাঁর ভালোবাসা কমে জাওয়ার ভিতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِه وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِه فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللهُ بِاَمْرِه ـ وَاللهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ توبة ـ 24

অর্থ : আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধনসম্পদ, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং সেই ব্যবসায় যাহাতে তোমরা মন্দা পড়িবার আশঙ্কা করিতেছ আর সেই গৃহসমূহ যাহা তোমরা পছন্দ করিতেছ তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের চেয়ে এবং তাহার রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক এই পর্যন্ত যে আল্লাহ তায়ালা নিজের নির্দেশ পাঠাইয়া দিবেন। আল্লাহ ফাসেক অর্থাৎ অমান্যকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। -সূরা তাওবা-২৪

মাহবুব মাওলার সাথে এমন ভালোবাসা যা সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য পাবে। সেই ভালোবাসায় সাক্ষাতের পাগলামি, অর্থাৎ শাহাদাতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, যা ঈমানের শর্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ (سورة البقرة - 286)

অর্থ : আল্লাহ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভালো যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই। হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।'-সূরা বাকারা-২৮৬

ঈমান ও ভালোবাসা সৃষ্টির পদ্ধতি হলো, আল্লাহর জিকির ও তাকে স্মরণ। যা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের উপর ওয়াজিব। জিকির সম্পর্কে আমাদের ধারণা হলো শুধুমাত্র মুখে আল্লাহর নাম জপা, হামদ-ছানা ও তাকবিরের শব্দগুলো বলার নাম হলো জিকির। অবশ্যই মুখে আল্লাহর নাম নেয়া তো প্রশংসনীয়। এগুলোও জিকির। তবে পরিপূর্ণ জিকির নয়। আরবিতেও জিকির দ্বারা ঐটাই বুঝায় যা আমাদের উর্দূ ভাষায় প্রচলিত আছে। তাহলো স্মরণ করা, মনে রাখা।

فاذكروالله لذكركم .....

মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ আল্লাহকে স্মরণ করবে, এটা ওয়াজিব। এ থেকে উদাসিন হওয়া হারাম। মুখে আল্লাহর নাম নেয়া, তার গুণগান করা হলো মুখের জিকির। অন্তর থেকে ধ্যানের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করাকে قلبى ذكر কলবী জিকির বলা হয়। মস্তিষ্ক দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি জীব নিয়ে চিন্তা-ফিকির করাকে মুরাকাবা বলা হয়। সেটা হলো দেমাগী জিকির।

হাদিসে আছে একমুহুর্ত আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ফিকির করা ৮০ বছর নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এর সামনে হল রূহের জিকির। সর্বদা সেই প্রজ্ঞাময় আল্লাহকে স্মরণ করা যাকে মুশাহাত বলা হয়। এই জিকিরকে মাকামে এহসান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فانك يراك

অর্থ :[১] ইহসান হলো তুমি আল্লাহর ইবাদত কর কেমন যেন তুমি তাকে দেখছ যদিও তুমি তাকে দেখ নাই নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।

প্রতিটি অঙ্গের পৃথক পৃথক জিকির আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য যেই অঙ্গ ব্যবহার করা হয় সেটা হবে সেই অঙ্গের জিকির।

আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ চাই সেটা মানুষের শরীরের অঙ্গ অথবা অন্য কোনো জিনিষ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে ব্যবহার করা উচিত। আর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিপূর্ণ আদর্শ সুন্নাত, অনুযায়ী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

একথা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, মানুষ যদি নিজের অস্তিত্ব এবং তার পুরো পরিবেশকে জিকির বানাতে চায় তাহলে তার সবচে সহজ পদ্ধতি হলো সুন্নাতের এত্তেবা করা। যেই হাত নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী উঠছে সেটা জিকিরকারীর হাত। যেই পা নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী চলে সেটা জিকিরকারী পা। যেই চোখ নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার হয় তাকে সেটা জিকির কারী চোখ। যেই বাড়ি নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী নির্মাণ ও পরিচালিত হচ্ছে, সেটা জিকিরকারী বাড়ি। এমনিভাবে যেই শহর, যেই মসজিদ, যেই পরিবেশ এবং যেই জীবন নবী সা. এর শহর, মসজিদ, পরিবেশ এবং জীবন অনুযায়ী চলছে বাস্তবিক অর্থে সেগুলো জিকিরকারী। জীবন, পরিবেশ, শহর, মসজিদ মাদরাসাগুলোকে যদি জিকিরকারী বানাতে হয় তাহলে শতভাগ নবীর পদ্ধতির উপর আনতে হবে। ঐ সময় পর্যন্ত নবীর পদ্ধতির উপর আনা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ জিনিসগুলোর উপর দাওয়াতি কাজের প্রাধান্য হবে।

لعك بايع

-সূরা শুআরা-৩

এর দরদ এর সাথে সম্পৃক্ত না হবে। এই জন্য আসল জিকির অন্বেষনকারী সত্য জাকের হওয়ার জন্য দাওয়াত একটি পদ্ধতি।

দাওয়াতি কাজে মাদরাসা ওয়ালাদের জন্য রয়েছে চলার পথ

[১]. ইহসান দ্বারা উদ্যেশ্য হলো ইখলাস অর্থাৎ একনিষ্ঠতা। (মিশকাত: পৃ. ১১)

মাদরাসার ইতিহাস অনেক পুরানো। মাদরাসার কথা বললেই মন ওই মাদরাসার দিকে চলে যায় যে মাদরাসার ছাত্র ছিল পুরো মানব জাতির রূহসমূহ। আর সেই মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন প্রজ্ঞাময় সেই মহান রাব্বুল আলামিন। কুরআনে কারিমে এই ক্লাশের কথা উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক এই ব্যাপারে বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ .

অর্থ: এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করে ছিলেন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়ে ছিলেন (আর জিজ্ঞেস করেছিলেন) আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়? আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষী দিচ্ছি (এবং এ স্বীকারোক্তি আমি এই জন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন বলতে পারবে, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'।- সূরা আরাফ-১৭২

এই আয়াত থেকে মাদরাসার একটি মৌলিক বিষয়-বস্তু নির্গত হয়েছে। তা হলো পালনকর্তার স্বীকারোক্তি 'আলাস্তু বি রব্বিকুম' আমি কি তোমাদের রব নই? এই মাদরাসাটি ছিল ব্যাপক। এর মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মাদরাসার বিষয়-বস্তু ঠিক হয়। একবার একটি বিশেষ ক্লাশ নেয়া হয়েছে। যে ক্লাশের ছাত্ররা ছিলেন শুধু মাত্র আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)। আর শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে হাকিমের মধ্যে বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِىْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

অর্থ: এবং (তোমাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করো) যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন। আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করে যিনি তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করেন তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।

আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার কর এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছ? তারা বলেছিল আমরা স্বীকার করেছি। আল্লাহ বললেন তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম। -সূরা আলে ইমরান-৮৫

আল্লাহ তায়ালা সকল আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? এই ছবক দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই অঙ্গীকারের মধ্যে পূর্ণ প্রশিক্ষক বা মুআল্লিম শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসার এবং তিনি চলে যাওয়ার পর পর্যন্ত এই অঙ্গীকার শামিল হবে। অর্থাৎ এই অঙ্গীকার থেকে যাবে। যেন এ কথা বলা হচ্ছে যে, অঙ্গীকার কর আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতির উপর এবং এই ছবককে স্মরণ করাও এবং আগত ব্যক্তিদেরকে এই পদ্ধতির খবর দাও বা বলে দাও। সকলেই বলল আমরা তা স্বীকার করেছি। এর পরে আরো একটি ক্লাশ হলো, সেই ক্লাশের ছাত্র ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আর শিক্ষক ছিলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ পাক বলেন- এবং আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। এরপর যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করলেন তখন সরকারি ক্লাস এর সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন সবক মনে করিয়ে দেয়ার জন্য, লিখিত মৌখিক এবং ব্যবহারিক অনুশীলন করার জন্য, বিভিন্ন যামানার শিক্ষক এবং টিউটার এসেছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

অর্থ: আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।

-সূরা ফাতির-২৪

সকল নবী "আলাস্তুবি রাব্বিকুম" (আমি কি তোমাদের প্রভু নই) কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার আনুগত্য কর।" এই বিষয়ের ক্লাশ দিয়েছেন, পড়িয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে তোমরা নিজের প্রভুকে চিন। তাকে ভয় কর। যেভাবে আমি তাকে ভয় করে দেখিয়েছি। এভাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তার মাধ্যমে এই ক্লাশ পরিপূর্ণ করে

দেয়া হলো। আল্লাহ পাক বলেন–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) নির্বাচিত করে দিলাম।

- সূরা মায়েদা-০৩

এখন ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রস্তুতি নেয়ার সময় এসেছে। এই মুসলিম জাতি তারা যেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মতো পুরো মানব জাতির সামনে আলোচনা করবে। এখন সময় এসেছে পরীক্ষা দেয়ার। জীবনের প্রস্তুতি নেয়ার। স্মরণ করার জন্য সময় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ .

অর্থ: যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনি ক্ষমাশীল পরাক্রমশালী।

- সূরা মুলক-২

পরীক্ষা খবই নিকটবর্তী। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক আরো বলেন–

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

অর্থ: কিয়ামত কাছে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে।

-সূরা কামার-১

লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা

এই পরীক্ষা মৌখিক, লিখিত ও প্রেক্টিক্যাল। মৌখিকভাবে এই প্রশ্ন পূর্বেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন আউট করে দেয়া হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা হবে কবরে। সেখানে প্রশ্ন হবে তিনটি। যা রুহের জগতে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে শিখিয়ে ছিলেন। তোমার প্রভু কে? তোমাদের উত্তর যদি হয় আমাদের প্রভু হলেন আল্লাহ। তিনিই পালনকর্তা। নেয়ামত দাতা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবনযাপন করেছ কি না? অর্থাৎ তোমার ধর্ম কী?

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী যদি জীবনযাপন করে থাক, আর তাকে রব জেনে ও মেনে জীবনযাপন করে থাক, তাহলে কোন পদ্ধতিতে জীবনযাপন করেছ? আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে জীবনযাপন করার একমাত্র পথ হলো নবীজীর আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যদি এই মৌখিক পরীক্ষার উত্তর সঠিক হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফেল-পাসের রেজাল্ট জানা যাবে না। এর পর আরো একটি লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। তা হবে আমি কি তোমাদের প্রভু নয়? এ সম্পর্কিত।

প্রথম: তোমার জীবন কিভাবে কাটিয়েছ?

দ্বিতীয় : তোমার যৌবন কিভাবে কাটিয়েছ?

তৃতীয়: মাল কোন পদ্ধতিতে অর্জন করেছ?

চতুর্থ : সেই মাল কোথায় খরচ করেছ?

পঞ্চম: ইলম কিভাবে অর্জন করেছ আর তা কিভাবে ব্যবহার করেছ?

এরপর প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা হবে পুলসিরাতে। নিজ রবকে রব বলে মেনে চলার অনুশীলন করেছ কি-না?

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۝

অর্থ : অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। সে বলবে, নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিতো থাকবে। বিগতদিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। -সূরা আল- হাক্বাহ্ ১৯-২৪

আর যারা ফেল করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ

۞ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۞ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ ۞ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۞ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞

যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেলো। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে: ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। -সূরা হাক্বাহ -২৫-৩২

এতো সহজ সুযোগ ও ছাড় দেয়ার পরও যারা ফেল করবে তাদের সংখ্যা হবে কম। এর জন্য তার যেই শাস্তি হবে সেটাও তুলনামূলকভাবে কম। কারণ আসল শিক্ষক রুহ জগতে প্রথমেই শিখিয়েছেন। এর পর মুআল্লিমীনদের সরদার, রাহমাতুল্লিল আলামিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর করে তাঁর কথা ও আমল দ্বারা শিখিয়েছেন। এর পর আবার বিস্তারিতভাবে সহজ পদ্ধতিতে কুরআনের রূপে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন "আমি উপদেশ অর্জনের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। আছে কেউ এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে?" আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- "এই কুরআন সকল জিনিসের ব্যাখ্যা। মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। এই কুরআনে কোনো সন্দেহ নেই মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়াত। এই কুরআনে কোনো গিল্টি নেই যাতে মানুষ ভয় করে।"

এর পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্ন আউট করে দিয়েছেন। এবার ছাত্রদের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, পরীক্ষকের রুচি কেমন? কোন পদ্ধতিতে উত্তর দিলে পরীক্ষক খুশি হবেন এবং নাম্বার বেশী দেবেন? এই সমস্যারও সমাধান দেয়া হয়েছে। উত্তর দেয়ার পদ্ধতি ও তার আমলী নমুনাও দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অর্থ : যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।

-সূরা আহযাব ২১

উত্তর দেয়ার পদ্ধতি

উত্তর দেয়ার পদ্ধতি হবে, আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতি অনুযায়ী। এর প্রস্তুতির জন্য লম্বা সময় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ -

সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই। - সূরা ফাতির-৩৭

এছাড়াও নাম্বার দেয়ার ক্ষেত্রেও প্রশস্ততার মুআমালা করা হয়েছে। যে নেক কাজ করবে কমপক্ষে দশগুন বেশী সওয়াব পাবে। আর পাপ করলে মাত্র একটি গুনাহ লিখা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।-সূরা আনআম-১৬০

এতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রের ফেল হওয়া কতই না দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। যে কেউ এর অনুমান করতে পারে।

ছোট ও সাধারণ একটি প্রশ্ন "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" এত সহজ ও অসংখ্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই শর্ত দেয়া হয়েছে যে, এর পদ্ধতি হবে আমার নবীর নিয়ম অনুযায়ী।

মোট কথা এই পরীক্ষায় পাস করার জন্য, মাদরাসার হক আদায় করার জন্য এই দুনিয়া নামক মাদরাসায় সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের রব হলেন আল্লাহ। এই দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্য হলো এই সবক শিখা। মুআমালার সবকিছুর মধ্যে এহসানের মর্যাদা অর্জন করা। আসল পালনকর্তা মালিক হলেন আল্লাহ। যার কোনো শরিক নেই। তিনি সর্বদা

আমাদের সাথে থাকেন। আমাদেরকে দেখছেন। হাদিসে জিবরাইলে উল্লেখ আছে, মাকামে এহসান হলো এই যে, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে কর যেন আল্লাহকে দেখছ। এমন যদি না হয়, তাহলে মনে কর তিনি তোমাকে দেখছেন।"

আল্লাহকে যখন মেনে নিলাম। রব হিসেবে জানলাম। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলা উচিত। এর পদ্ধতি হলো প্রতিটি কাজে শতভাগ নবীজীর অনুসরণ করা। জীবনের প্রতিটি কাজের মাপকাঠি হবে নবীজীর পদ্ধতি। দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার ও মর্যাদাবান হওয়ার মাধ্যম ঐ জীবন যা নবীজীর পদ্ধতি অনুযায়ী অতিবাহিত হয়। ঐ বাড়ি দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা বয়ে আনবে যা নবীজীর তরিকায় হবে। ঐ মসজিদ গ্রহণযোগ্য প্রশংসিত হবে যা নবীজীর মসজিদের নমুনায় হবে, ঐ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে যা শুধুমাত্র মাদরাসায়ে নববী ও সুফফায়ে নববীর নমুনায় হবে। যার সব কিছু নবীজীর শতভাগ অনুসরণে হবে। কুরআন মাজিদ এই উদ্দেশ্যের প্রতি এভাবে ইংগিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

অর্থ: আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে? -সূরা তাওবা-১২২

মাদরাসার উদ্দেশ্য কি শুধু আলেম হওয়া? আর সার্টিফিকেট নেয়া? মাদরাসায়ে নববী থেকে ফারেগ হয়ে প্রত্যেক ছাত্র চাই মুজাহিদ হোক। আর ব্যবসায়ী হোক। আমির হোক চাই যা কিছুই হোক না কেন, সকলেই দা'য়ী ছিলেন।

আশারাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন "আসল কাজ তো আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। তা সংরক্ষণের জন্য মাদরাসার প্রয়োজন। মাদরাসা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ইলম অর্জন করবে। আর আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে। যার সহজ পদ্ধতি হলো ওয়াজ নসিহত। আর ক্লাস নেয়া হলো উপলক্ষ। এই ব্যস্ততাও জরুরী। যেমন নামাযের জন্য ওযু জরুরী। এখন যদি কেউ সারাদিন বদনায় পানি ভরতে থাকে ওযু করার জন্য কিন্তু নামাজ আদায়

করল না। তাহলে এই ব্যক্তি প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য হবে না। এমনি ভাবে কেউ শুধু পড়া-লেখা করতে লাগল আর দাওয়াতি কাজ করল না তাহলে সে লক্ষ্যকে হারিয়ে উপলক্ষ্যের প্রতি সময় ব্যয় করল।

মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও সফল ভাবে গড়ে তোলার জন্য মাদরাসায়ে নববীর অনুসরণ করতে হবে। দাওয়াতের মুবারক কাজ করতে হবে। এর চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি আমার বুঝে আসে না।

দাওয়াত হলো দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার একটি পথ

কুরআনে কারিম মুসলমানদেরকে মৌলিকভাবে দুটি দলে বিভক্ত করেছে। আল্লাহর দল ও শয়তানের দল। সুপথগামী ও বিপথগামী। সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী। এই দুই দলের মধ্যে কারা শান্তি ও নিরাপদের হকদার? কুরআনে কারিম এ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। - সূরা আনআম-৮১

আল্লাহ পাক আরো বলেন-

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকির সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। -সূরা আনআম-৮২

ঈমান এবং জুলুম এ দু'টি স্ববিরোধ শব্দ। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর উদাহরণ হলো এমন- আলো জ্বললে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আলো যেই পরিমাণ হবে ঠিক সেই পরিমাণ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, ঈমানদারগণই হলেন নিরাপদ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত। তবে নিজ ঈমানের সাথে জুলুমকে যেন মিশ্রিত না করে।

ঈমান হলো আলো, জুলুম হলো অন্ধকার। আলো যত বেশী হবে অন্ধকার ততো কম হবে। অন্ধকার যদি বেশী হয় তাহলে আলো কমে যাবে। ঈমান যতো পরিপূর্ণ হবে, জুলুম ততো কমে যাবে। আর জুলুম যেই পরিমাণ বাড়বে ঈমান সেই পরিমাণ কমবে।

ঈমানদার তো সে, যে হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়। জালেম তো সে, যে অন্যের হক নষ্ট করে। মানুষের উপর যেই হক অর্পিত হয়, তা দুই প্রকার হয়ে থাকে। আল্লাহর হক যা মহান। বান্দার হক যা গুরুত্ব পূর্ণ। আল্লাহর হক হলো তাকে যেইভাবে মানা উচিত সেইভাবে মানার হক আদায় করা। তার বিপরীত তার হকের সাথে কাউকে অংশীদার বানানো, যেমন তাঁর প্রভুত্বের ও বন্দেগীর মধ্যে তাঁর ইলমের ও গুণের এবং সত্তার সাথে কাউকে অংশীদার বানানোকে শরিক বলা হয়। নিজ স্রষ্টাকে তার হক না দেয়ার জন্য এটা সবচেয়ে বড় জুলুম।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ□ وَهُوَ يَعِظُهُ□ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ: যখন লোকমান তার পুত্রকে বলল: হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করা মহা অন্যায়।

-সূরা লুকমান-১৩

আল্লাহর হকের পর সবচে বড় হক হলো, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হক আদায় করা। অর্থাৎ ঈমানের হক ঐ সময় পর্যন্ত আদায় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের খায়েশ বা ইচ্ছা সমূহ সুন্নাতের অধীনে না হবে। অর্থাৎ সুন্নাত তবিয়ত হতে হবে। তাই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার খায়েশ দ্বীনের অধীনে না আনতে পারবে। যা আমি নিয়ে এসেছি।"

এর উদ্দেশ্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাত স্বভাবে পরিণত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। সুন্নাতকে তবিয়ত বানানোর উদাহরণ হলো– মাছের চাহিদা হলো পানি। যদি তাকে পানি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখা হয়, তাহলে সে ছটফট করতে থাকবে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। সে পানি ছাড়া বাঁচতে পারবে না। ঠিক মুমিনের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত। পানির মতো সুন্নাত তার স্বভাব হতে হবে। সুন্নাত ছেড়ে দেয়ার গুনাহ দেখে তার ছটফটানি উঠবে। সুন্নাত বিহীন পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মনে হবে।

কোনো মুমিন যদি নবীজীর আদর্শের আলোকে সুন্নাতের পরিবেশ দেখতে চায় তাহলে এ বাস্তবতা তার সামনে সুস্পষ্ট হবে যে, দাওয়াতি

পরিবেশ হলো আসল পরিবেশ। যেখানে মানুষ কুফর ও শিরকের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেখান থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে আনা হলো আসল নববী ও সুন্নাতী পরিবেশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক আদায় করার জন্য জরুরী হলো নিজ পরিবেশকে দাওয়াতি পরিবেশ বানানো। তাঁর প্রতিটি কাজে দাওয়াতের প্রাধান্য দেয়া। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরো একটি হক হলো তাঁকে ভালোবাসা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী আমাকে ভালো না বাসবে।"

নবীজীর ভালোবাসা হলো এক মহা সম্পদ

নবীজীর ভালোবাসা, মুসলিম জাতির জন্য দামী ও সম্মানিত সম্পদ। তাঁর সত্তার ভালোবাসা, তাঁর কথা, আমল এবং প্রতিটি জিনিসের ভালোবাসা, এমনকি তাঁর পরিবারের তাঁর সাহাবাদের, তাঁর শহরের ভালোবাসা সেই শহরের গলির কুকুরের সাথেও ইশক ও বিশ্বাসের সম্পর্ক, একজন মুমিনের জন্য খুবই দামী উপার্জন। যারা কাজ করে সফলতা অর্জন করেছে, যাদের সম্পর্ক পুরো দ্বীনের সাথে তারাও এই সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

আফসোস, কিছু ইহুদি ও ইসলামের দুশমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আন্দোলন থেকে, জাতির ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। এর জন্য তারা সুপরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া তুলে দিয়ে আহলে বাইতের ভালোবাসা বিশ্বাসকে মানুষের অন্তরে শেষ করে দিতে চায়। আর অনেক সাদাসিধে মুসলমানকে এই কাজের মাধ্যম বানিয়েছে। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মহাব্বত সম্মান তাদের বিশ্বাস ঈমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া। ইমাম শাফী (রাহ.) এর প্রসিদ্ধ বাণী "আহলে বাইতের ভালোবাসা যদি দলছুট হয়। তাহলে সারা পৃথিবী সাক্ষী যে আমি রাফেজী (দলছুট)।"

প্রিয়নবীর ভালোবাসার আলামত হলো তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মানার জন্য, জানবাজি রাখার স্পৃহা রাখবে। তাঁর বাণীর মূল্যায়ন করবে। একজন ঈমানদারের জন্য তাঁর শেষ ওসিয়ত অনুযায়ী আমল করা উচিত। মানুষের শেষ ওসিয়তকে প্রতিপক্ষ এবং নিজের আত্মীয় স্বজনরাও মেনে নেয়। এবং মানুষ তা পূরণ করা ফরজ মনে করে। সারা জীবন যার সাথে লড়াই থাকে তাকেও কাছে টেনে নেয়। বিদায় হজ্জের সময় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার ঘোষণা

দেয়া হয়েছে এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল। -সূরা মায়েদা -৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বাস হয়ে গিয়ে ছিল এটাই তাঁর উম্মতের মাঝে একত্রিতভাবে শেষ ভাষণ। এর পর হয়তো আর সুযোগ হবে না। তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দিলেন। এই বিদায়ী ভাষণে, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষে যেই শব্দগুলো বলেছিলেন, সেগুলো সাধারণত সীরাতের সব বইগুলোতে পাওয়া যায়। উপস্থিত সকল মানুষকে লক্ষ করে প্রশ্ন করলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছিয়েছি? আমার দায়িত্ব আদায় করেছি? সকলেই উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। এই সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললেন - হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন। এর পর সকল উম্মতকে শেষ ওসিয়ত হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। বললেন- তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের মাঝে যেন এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়।

অনেক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ ভাষণ এটাই ছিল। তার ফলশ্রুতিতে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ভালোবাসা ও সেই শেষ ওসিয়তের উপর আমল করেছেন। তাই নববী জবান থেকে এই কথা বের হয়েছে, তিনি বলেন, "আমার সাহাবারা তারকার মতো, তোমরা তাদের মধ্য থেকে যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়াত পেয়ে যাবে।"

তারা শেষ ওসিয়তকে এভাবেই পালন করেছেন যে, তাদের উটের মুখ যেদিকে ছিল, সে দিকেই তারা বের হয়ে গিয়েছেন। অধিকাংশ সাহাবা তাদের বাড়িতে জানিয়েও যাননি যে, তারা কোথায় যাচ্ছেন। তারা একথা বুঝেছেন যে, আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমাদেকে তিনি যেই ওসিয়ত করে গেছেন, তার উপর

আমল করেছি কি না? তারা কেউ গিয়েছেন চীনে। কেউ আবার আফ্রিকায়। কেউ এসেছেন হিন্দুস্থানে। একেক জন একেক স্থানে গিয়েছেন। পুরো দুনিয়া সফর করেছেন। আর সেখানেই তাদের কবর হয়েছে। তাঁরা প্রিয় নবীর সেই হক আদায় করেছেন।

এ কথা পূর্বেও আলোচনা হয়েছে। দ্বীনি পরিভাষা ও তার বিধি-নিষেধ গুলো সে ভাবেই বুঝা ও আমল করা, যে ভাবে সাহাবায়ে কেরাম বুঝেছেন ও আমল করেছেন। তার হক আদায় করেছেন। দ্বীনকে বিকৃতি থেকে বাঁচিয়েছেন।

দ্বীনের বিভিন্ন পরিভাষাকে বিকৃতি থেকে বাঁচানোর জন্য ওলামায়ে কেরামের একটি জামাত বলেছেন, এব্যাপারেও সতর্ক থেকেছেন যে, পরিভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে আসল পরিভাষাই রাখা। যেমন সালাতের অনুবাদ নামায ও সাওমের অনুবাদ রোজা করাও মাকরুহ বলেছেন।

আমাদের প্রিয় নবীর বিদায়ী ওসিয়ত "উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়" এর অবমূল্যায়ন করা, তাকে পাস কাটিয়ে চলা, এর পরও নবীর ভালোবাসার দাবি করা, কী পরিমাণ মিথ্যা হতে পারে, একটু ভেবেছেন কি?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম হুঁশিয়ার করেছেন। বলেছেন এই বছরের পর, আর তোমাদের সাথে সাক্ষাত হবে না। এর পর শেষ ওসিয়ত করেছেন। এই ওসিয়তের উপর আমল করা ছাড়া, ভালোবাসার হক আদায় হবে না।

এই বড় হকের পর, দ্বিতীয় নাম্বার হক হলো বান্দার হক। যাকে হক্কুল ইবাদ বলা হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হকদারকে তার হক আদায় না করা হবে অথবা নিজের হক মাফ না করাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হক আদায় হবে না। সকল মানুষের হক আদায় করা ঈমান ও ঈমানদারীর চাওয়া। আর সেই হকগুলো কুক্ষিগত করা এবং নষ্ট করা হলো জুলুম। যে পরিমাণ হক নষ্ট করবে, সে পরিমাণ জুলুম করবে। হকদারকে তার হক আদায় না করার কারণে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই পরিমাণ জুলুম বাড়তে থাকবে। তাই বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা খুবই জরুরী।

শরিয়ত আমাদের উপর অনেক হক অর্পণ করেছে। যেমন ঈমানী হক, রুহানী হক, চারিত্রিক হক ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হক হলো নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ ওসিয়তের উপর আমল করা। বুকভরা বেদনা নিয়ে, অন্যের কল্যাণ কামনায়, অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া।

তাদেরকে কুফর ও শিরক থেকে বাঁচানো। দোযখ থেকে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এই হক আদায় না করার কারণেই অনেক লোক কুফর ও শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করছে। চিরস্থায়ী ভাবে দোযখের ইন্ধন হচ্ছে। তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছানো, এটা আমাদের পক্ষ থেকে কত বড় জুলুম? [কারো কাছে অন্য কোনো ব্যক্তির কিছু খাবার জমা আছে। এগুলো তাদের হকদারকে দেয়ার কথা। আর সেই খাবার তাকে না দেয়ার কারণে যদি সেই লোক না খেয়ে মারা যায়, তাহলে সেটা কত বড় জুলুম? এর চেয়ে বড় জুলুম হলো কুফুর ও শিরকে ঘুরপাক খাওয়া মানুষকে ইমানের দাওয়াত না পৌঁছানো। তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর ফিকির না করা। এটা কি ঈমানদারদের কাজ? এমন মানুষকে মুমিন তো দূরের কথা মানুষ বলারও অধিকার রাখে না।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলুন– একজন চক্ষুবিশিষ্ট মানুষের সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তিকে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখেও তার হাত ধরে সেই আগুন থেকে বাঁচায়নি, তাকে কি মানুষ বলা যাবে? এমন পাষাণ দিলের অধিকারী মানুষকে কেউ মানুষ বলতে পারে না। আমাদের কাছে কুরআন মাজিদের নূর আছে। আছে আসমানী হেদায়াতের আলো। আর আমাদের সামনে পুরো দুনিয়া এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। হেদায়াতের পথ খোঁজা থেকে অন্ধ হয়ে দোযখের কঠিন পরিণামের দিকে যাচ্ছে। আর আমরা পুরো অনুভূতিহীনতার সাথে রহমতে আলমের উম্মত ও অনুসারী মনে করছি। এটা কেমন বে ইনসাফি আর কেমন জুলুম? পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব সত্ত্বেও নবীর আনুগত্যের দাবিদার আমরা।

আসুন আমরা মন থেকে একটু ভাবি। রাতের বেলা একাগ্রচিত্তে একটু চিন্তা করি। আমাদের ঐ বৃদ্ধ সুইপার, ঝাড়ুদার, যিনি পুরোটা জীবন বাথরুমের নাপাকি পরিষ্কার করতে করতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। যে নাপাক হাতে লাগলে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করি। যা কল্পনা করলে বমি চলে আসে। সেই সুইপার আমাদের সামনে কুফর ও শিরক করতে করতে বিভিন্ন কিছুর পূজা করে জীবন শেষ করে দিল। শেষ পর্যন্ত পাষাণ মৃত্যু

তাকে আঁকড়িয়ে ধরল। তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়ে দিল। আর আমাদের এই অনুগ্রহকারীর ভয়ানক শাস্তি একটুও ব্যথিত করল না। এ সত্ত্বেও নবীর এত্তেবা দাবি করা সুস্পষ্ট জুলুম ছাড়া আর কী হতে পারে? আর ঈমানের উপর বিজয়ের আশা করা কাল্পনিক পোলাও ছাড়া আর কী হতে পারে?

দাওয়াত ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হক আদায় হয় না

হক আদায় করার নাম হলো ঈমান। এর বিপরীত জুলুম। আল্লাহর হক হলো, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনা। তাঁর হক আদায় করা। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না বানানো। এ ব্যাপারে ঈমানদারের চৌকষ হওয়া উচিত। শিরকের গন্ধেও যেন ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং সে যেন তার পরিবেশকেও শিরকমুক্ত করে। কারণ এই জুলুম থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

অর্থ: আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠোর। -সূরা আনফাল-২৫

এর দ্বারা বুঝা গেল, জুলুম হচ্ছে কোনো অন্যায় জানার পরও তা দূর করার চেষ্টা না করা। এ কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। "শিরক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় জুলুম।" এই বাণী অনুযায়ী হক আদায় করার জন্য শিরককারীকে একত্ববাদের দাওয়াত দেয়া খুবই জরুরী।

এই দাওয়াতের মূল্যায়ন এবং শেষ ওসিয়তের হক আদায় করা ছাড়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক আদায়কারী হতে পারে না। বাকি মানুষের হক, কুফর শিরক থেকে বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া, বান্দার হক আদায় হতে পারে না। হক আদায় করা যেহেতু ঈমান আর তা না দেয়া হলো জুলুম। এমন ঈমান হবে যা জুলুম মুক্ত। ইসলাম একটি পথ। এ পথে চললে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হেদায়াত পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَ لَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকির সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। -সূরা আনআম ৮২

দাওয়াতি কাজ ত্যাগ করায় আখেরাতের লাঞ্ছনা

জালেমের পরিণাম এবং পরকালে তার লাঞ্ছনার কথা কুরআনে এভাবে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۝ يَا وَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۝ لَقَدْ أَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ۝

২৭. জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস। আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। ২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। ২৯. আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। -আল-ফুরকান -২৭-২৯

এখানে কয়েকটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা লক্ষণীয় :

১. প্রথমত : কোনো ব্যক্তি যতো বড় শিক্ষিত হোক, আর রুহানী শাইখ হোক, বা দার্শনিকই হোক না কেন, যদি নবীর পথ থেকে দূরে সরার দাওয়াত দেয়, তাহলে কুরআনের ভাষায় সে 'ফুলানা' (অমুক)-দের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. জালেম যেই জুলুমের কারণে সবচে বেশি লজ্জিত হবে, সেই ভুলকে স্বীকার করে নিবে। নিজের হাত চিবাতে থাকবে। তা হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর অনুসরণ না করার কারণে।

৩. যে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ ছাড়া, দুনিয়ার যে কোনো মানুষের অনুসরণই করুক না কেন, সে হবে জালেম। কেয়ামতের দিন সে খুবই লজ্জিত হবে।

৪. এই আয়াতের মধ্যে সাবিল শব্দ দ্বারা বিশেষ করে রেসালাতের পথ বুঝানো হয়েছে। রেসালাতের পথ সম্পর্কে অন্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قل هذه سبلى ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن تبعى

অর্থ: বলে দিন: এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে জেনে বুঝে

দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।-সূরা ইউসুফ-১০৮

এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত– সীরাত এবং সাবীল দুটো পৃথক পৃথক জিনিস। সীরাত দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ সোজা পথ। যেমন হাইওয়ে। আর সাবিল ঐ পথ, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে বানানো হয়। প্রিয় নবী যা কিছু বলেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰى

৩. এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। ৪. কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। –আন-নাজম-৩-৪

বুঝা গেল রেসালাতের পথ হলো বুঝে-শুনে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া। এছাড়া যত পথ আছে তা হলো, অমুকের পথ, যা এই আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। যারা পরকালে লাঞ্ছিত হবে এবং হাত কামড়াবে।

বিজয়ীদের জন্য একটি পথ হলো দাওয়াত

দুনিয়ার যে কোনো ময়দান আপনি বিজয় করতে চান, তা বিজয় করার জন্য দাওয়াতের পথ থেকে সহজ আর কোনো পথ নেই। আপনি যদি বিজ্ঞানীদের উপর বিজয়ী হতে চান। তাহলে আপনাকে বিজ্ঞানীদের একটি টিম তৈরি করতে হবে, যারা বর্তমান বিজ্ঞানীদেরকে পরাস্ত করে দিবে। এটা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। এর বিপরীত এই বিজ্ঞানীদেরকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা অনেক সহজ। কারণ তারা সৃষ্টিজীবের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠছে। তারা মারেফতের একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছে গেছে। এখন যদি আপনি তাকে দাওয়াতের মাধ্যমে তার দৃষ্টির পর্দাকে সরিয়ে দেন, তাহলে তাওহীদ ও ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার খুবই নিকটবর্তী হয়ে যাবে। এভাবে আপনি বিজ্ঞানের জগতে বিজয় অর্জন করতে পারবেন।

এমনি ভাবে যদি আপনি রাজনীতির মাঠে বিজয়ী হতে চান। বর্তমান ইসলামি রাজনীতি করে মুসলমানদেরকে আয়ত্ত্বে আনা খুবই কঠিন। এর বিপরীত রাজনীতিবিদদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মাধ্যমে এই ময়দানে বিজয় অর্জন করা খুবই সহজ। এমনিতেই আমাদের ধর্ম, কোনো

মানুষের অন্তরকে জয় করা, তার হেদায়াতের মাধ্যম হওয়া, পুরো দুনিয়া বিজয় করা থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন আজকে জিহাদের পতাকা ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যার উপর আল্লাহ ও তার রাসূল খুশি। সকল সাহাবাগণ এই আশায় ছিলেন যে, এই পতাকা যেন আমার ভাগ্যে চলে আসে। যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাজির সুসংবাদের অধিকারী হয়ে যাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রা. কে ডেকে তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। এবং বললেন যাও, দাওয়াত দাও, আর জিহাদ কর। তোমার মাধ্যমে যদি একটি মানুষও হেদায়াত পেয়ে যায়, তাহলে সব কিছু থেকে উত্তম। যার উপর সূর্য উদিত হয়। যেন পুরো পৃথিবীকে বিজয় করার থেকে একজন মানুষের হেদায়াত পেয়ে যাওয়া বেশী উত্তম।

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের জন্য দাওয়াত হলো আত্মশুদ্ধির পথ

আধ্যাত্মিক সুফিগণ নফসের প্রশিক্ষণের জন্য যেই পরিমাণ ইবাদত, রিয়াজত এবং মুজাহাদা করান, এই সবগুলোর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহকে রাজি করা। আর তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, যেন সব কিছুর উপর প্রাধান্য পায়। আল্লাহ যেন তাদেরকে ভালোবাসেন। প্রেমিক বানিয়ে নেন। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নেয়ামত যেন তাদের অর্জন হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্‌ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। -আল ইমরান-৩১

নবীর ভালোবাসা ও তার এত্তেবা, অনুসরণ– প্রেমিক হওয়ার একমাত্র পথ বলা হয়েছে। এত্তেবা তো তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন দাওয়াত তার জীবনের উদ্দেশ্য হবে।

অন্য এক হাদিসে এরশাদ হয়েছে– "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে মানুষের অধিক উপকারে আসে।" আল্লাহর নিকট ভালো ও পছন্দনীয় ব্যক্তি তিনি যিনি সৃষ্টিজীবের উপকারে আসেন। তাই মানুষ যত বেশী

মানুষের উপকারে আসবে ততো বেশী আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হবে। তাই ইরশাদ হয়েছে, সকল সৃষ্টিজীব, আল্লাহর 'ইয়াল'প্রতিবেশী। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সৃষ্টির সাথে দয়া, মহব্বত ইবাদাত থেকে বেশী পছন্দ। মাখলুকের সবচে বেশী কল্যাণকামী হলো, তার আখেরাতের ফিকির করা। যেমনটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা।

ছাত্র থাকা অবস্থায়, ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর একটি ঘটনা পড়ে ছিলাম। একবার তিনি ঘুম আর জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি সময়ে দেখলেন, একজন ফেরেস্তা একটি খাতা নিয়ে তার রুমে বসে কিছু লিখছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে? এখানে কী লিখছেন? ফেরেস্তা বললেন, আমরা ফেরেস্তা। আল্লাহকে যারা ভালোবাসে তাদের নাম লিখছি। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বললেন, আমার নামটিও সেই লিস্টে লিখে নিন। তারা লিখতে অস্বীকার করলেন। ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) বললেন আচ্ছা আমার নাম আল্লাহর মাখলুককে ভালোবাসার লিস্টে লিখে নিন। ফেরেস্তারা চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন যখন এলেন তখন দেখালেন ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) এর নাম মাখলুকদেরকে ভালোবাসার লিস্টের প্রথমে। সেই ফেরেস্তা বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম দিয়েছেন, ইবরাহীম বিন আদহাম এর নাম আমাকে ভালোবাসে তাদের লিস্টে উঠিয়ে নাও। কারণ আমার মাখলুককে মহব্বতকারী আমার কাছে খুবই প্রিয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, মানবতার সবচে বড় কল্যাণ হলো, আখেরাতের ফিকির। তাদেরকে চিরস্থায়ী দোযখের আগুন থেকে বাঁচানো। এই জন্য আধ্যাত্মিকতার পথে চলার জন্য সবচে সহজ পথ হলো, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মোবারক কাজ।

মোট কথা, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ময়দানে সব প্রকার সফলতা রেখেছেন দাওয়াতের মধ্যে। একারণেই তাঁর প্রিয় বান্দা আম্বিয়া দেরকে সম্মানিত করে পাঠিয়েছেন। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, বিনদন মুলক মনভাব রাখে, তাদের জন্যও দাওয়াত থেকে উত্তম কোনো ব্যাস্ততা নেই। এই পথে এমন এমন ঘটনা সমূহ সামনে আসে, আপনি যদি কাউকে শোনাতে শুরু করেন তাহলে তারা অবাক হয়ে যাবে। এমন ঘটনা যখন আপনি নিজে দেখবেন তখন আপনার কাছে কেমন মনে হবে।

শর্ত হলো আমাদের মাঝে দাওয়াতের স্পৃহা থাকতে হবে এবং নববী ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, কোনো প্রতিদান না চাওয়ার ফর্মুলা অনুযায়ী আমল

করতে হবে। আর দাওয়াতের এই কাজকে নিজের অস্থিত্ব ও মুসলিম জাতির দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য মনে করতে হবে।

দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে কিভাবে?

এখানে একটি ধারণা হতে পারে যে, দাওয়াতের কাজ তো একটি বড় কাজ। এর জন্য প্রয়োজন অনেক জ্ঞান। প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার। একজন মানুষ এই কাজ কীভাবে আঞ্জাম দিবে? তাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে কীভাবে? এর জন্য কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

প্রথম কথা তো হলো, দাওয়াতি কাজে প্রশিক্ষণের চেয়ে বেশী প্রয়োজন অন্তরের ব্যথা বেদনা। যেখানে নববী দরদ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে নিজেই কাজ করে ফেলা যায়। তাই 'ভালোবাসা নিজেই তোমাকে ভালোবাসার আদব শিখিয়ে দিবে'।

দাওয়াতকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে কিভাবে? এবং বানানোর দ্বারা লাভ কী? আমাদের একজন মুহসিন মুরব্বি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যদি একটি হসপিটাল তৈরি করে, সেই হসপিটাল তৈরির উদ্দেশ্য থাকে রোগীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা। সেই হসপিটালের চিকিৎসা তো শুধু ডাক্তারই করবে। কিন্তু অন্যান্য আমলারাও চেষ্টা করবে যে, সেবাটা যেন তাদের রোগমুক্তির নীতিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ ঝাড়ুদার ঝাড়ু দেয় এই পদ্ধতিতে, যাতে তার চিকিৎসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাবুর্চি যখন রান্না করে, রোগীর সুস্থতার দিকে খেয়াল রেখে তার চাহিদা অনুযায়ী পাক করে। এ সব কিছুর উদ্দেশ্য হয় রোগীর রোগমুক্তি করা।

এভাবে যদি পুরো জাতি একত্রিত ভাবে এই কাজকে নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। যদিও এক শ্রেণীর মানুষ সরাসরি দাওয়াতি কাজের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিবে। জাতির অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ এর পরিবেশ তৈরি করবে। সকল কাজের উদ্দেশ্য বানাবে দাওয়াতকে।

নবীজীর গোলাম হওয়ার শানতো এমনই হওয়া উচিত। মুসলমান হবে দেহধারী দাওয়াত। যদি জীবনের উদ্দেশ্য দাওয়াত বানিয়ে নেয় তাহলে জীবনের প্রতিটি কাজ নিজে নিজেই দাওয়াত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা পেশ করতে চাই। আমার এক বন্ধু, বড় একটি শহরের মসজিদে থাকতেন। তিনি দাওয়াতি কাজ করছেন। দাওয়াতের মানসিকতাও তৈরি হয়ে গেছে। তার কাছে একজন মুসলমান মুসল্লি এসে দু'আ চাইল, বলল,

আমি একজন হিন্দু লালাজীর দোকান ভাড়া নিয়ে ছিলাম। এখন সে দোকান খালি করার জন্য মামলা করে দিয়েছে। আপনি দুআ করুন আমার যেন দোকান না ছাড়তে হয়। মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কত দিন থেকে লালাজী সাবের দোকান ভাড়া নিয়েছেন? সে বলল আট বছর যাবত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন চুক্তি কত দিনের ছিল? সে বলল, এগার মাসের। এতে ইমাম সাহেব খুব রাগান্বিত হলেন। বললেন, আমি তো লালাজীর জন্য দুআ করব। কারণ বেচারা নিশ্চয় মনে করবে এ কেমন মুসলমান? যে চুক্তি রক্ষা করে না। সে চলে গেল। এর পর অন্য এক মুসল্লি এলো। যিনি লালাজীর দোকান ভাড়া নিয়েছে। এসে মাওলানা সাহেবকে বলল, লালাজী তো দোকান ছেড়ে দিতে বলেছে এখন কী করতে পারি? মাওলানা সাহেব তাকেও কিছু প্রশ্ন করলেন, তার লেন-দেন ও চুক্তি ঐ পূর্বের ব্যক্তির মতোই ছিল। মাওলানা সাহেব পরামর্শ দিলেন, আপনি এখনই দোকান খালি করে দিন। কারণ এটা ঈমানের পরিপন্থী। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।"

এই লোকটি বুঝতে পারলেন। পরের দিন দোকান খালি করে চাবিটা লালাজীর হাতে দিয়ে দিলেন। লালাজী খুবই বিস্মিত হলো। লালাজী বলল, কী ব্যাপার? তোমাকে একবার বলার সাথে সাথে দোকান খালি করে দিলে? সে বলল, আমাদের মাওলানা সাহেব বলেছেন। তাই চাবি দিয়ে দিয়েছি। সে বলল, কোন মাওলানা সাহেব? তার সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিও। সে মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করলো। লালাজী মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তাকে দোকান খালি করতে বললেন কেন? মাওলানা সাহেব বললেন, আমি তো তাকে ধর্মের একটি মাসআলাই বলেছি মাত্র। আমাদের ধর্ম বলে যখন চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায় তখন দোকান খালি করে দাও। লালাজী জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ! আপনাদের ধর্মে কি ভাড়াদাতা সম্পর্কেও বলা আছে? মাওলানা সাহেব তাকে বললেন, আমাদের ধর্ম জীবনের প্রতিটি জিনিসের শিক্ষা দেয়। এমন কি নখ কিভাবে কাটবে, মোচ কিভাবে ছাটবে। ইত্যাদি। সব কিছুই বলা আছে। লালাজী প্রভাবিত হলো। বলল, তাহলে এমন ধর্ম আপনারা অন্যকে দেন না কেন? মাওলানা সাহেব বললেন, আসলেই আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এর পর দাওয়াত চলতে থাকে। এক সপ্তাহ ব্যাপী প্রতিদিন রাতে লালাজী মাওলানা সাহেবের কাছে এসে ধর্ম সম্পর্কে অনেক

কিছু জানতে পারে। আল্লাহর রহমতে এক সপ্তাহ পর সেই মসজিদেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের দিন সকালে সেই লোকের কাছে গেল যিনি দোকান খালি করে দিয়েছিল। চাবি দিয়ে বলল, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, একই ভাড়ায় আপনি দোকান চালাতে থাকেন।

তাই জীবনের উদ্দেশ্য যদি দাওয়াত থাকে তাহলে মানুষ দেহধারী দাওয়াত হতে পারবে। কখনো মৌখিক দাওয়াতের প্রয়োজনই আসে না।

ওই জাতি উত্তম জাতি যার উপাধি ছিল

সীরাত ও দাওয়াতের ইতিহাস এ কথা বলে যে, মুসলিম জাতি যদি দাওয়াতের কাজ করা শুরু করে দেয়, তাহলে দুনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে ইসলামে প্রবেশ করবে। আপনি নববী যুগের পর্যবেক্ষণ করুন। সেখানে দুই শ্রেণীর মানুষকে ইসলামের বিরোধীতাকারী হিসেবে পাবেন। এক ঐসমস্ত লোক, যারা ইসলামকে ভুল বুঝত এবং ভ্রষ্টধর্ম মনে করতো। দ্বিতীয়ত ঐ সমস্ত মানুষ, যারা ইসলামকে সত্য বলে জানতো। কিন্তু হিংসা, অহংকার ও নেতৃত্বে ভাটা পড়ার ভয়ে বিরোধিতা করত। প্রথম শ্রেণীর মানুষের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে, এমন এক জনও পাওয়া যায়নি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে হুজ্জত পরিপূর্ণ হওয়ার পর, দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে ধুলিস্মাৎ করে দেয়া হয়েছে।

এখনও যারা ইসলামের বিরোধিতা করছে, কাছে থেকে যদি একটু পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে জানা যাবে তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিরোধিতা করছে। তাদের সামনে যদি ইসলাম পেশ করা যায় তাহলে সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর যারা ইসলামকে সত্য জেনেও ইসলামের বিরোধিতা করবে, অহংকার ও হিংসার কারণে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও ধুলিস্মাৎ করে দিবেন।

হুজ্জত পূরণ সম্পর্কে আমার মুরশিদ পীর হযরত মাও. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেছেন, ইতমামে হুজ্জাত হলো, মাদউ যেন বুঝতে পারে ইসলামই সত্য ধর্ম। সে যদি ইসলামকে সত্য মনে না করে তা হলে বুঝতে হবে আমরা দাওয়াতের হক আদায় করতে পারিনি। এতে আমাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে। মাদউ যেন বোঝে এই ব্যক্তি আমার হিতাকাঙ্ক্ষি হিসেবেই দাওয়াত দিচ্ছে। কারণ কল্যাণ, দরদ আর

ভালোবাসার সাথে যখন কাউকে দাওয়াত দেয়া হয়, তখন এর প্রভাব তার উপর পড়ে।

এব্যাপারে আমার একটি ঘটনা মনে আসে। যা আমি আরমোগানে বর্ণনা করেছি। আমার বড় মেয়েটি আমার কাছে এসে সময় নিল, তাকে সময় দিলাম। সে বলতে লাগল আব্বু বলুন তো যতো কাফের মুশরিক আছে, সবাই কি জাহান্নামে যাবে? আমি বললাম– অবশ্যই যাবে। চিরকাল আগুনে জ্বলবে। সে বলল– না চিরকাল জ্বলবে না। কখনো না কখনো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি বললাম– না কাফের মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে। আল্লাহ মিথ্যা বলেন না। তিনি তার কালামে পাকে বলেছেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। -আন-নিসা-১১৬

একথা শুনে সে খুবই অস্থির হয়ে পড়ল। পেরেশান হয়ে সে তার কথার মোড় ঘুরিয়ে বলতে লাগল, আব্বু বলুন তো তাদের ভুলটা কী? আল্লাহই তো তাদেরকে হেদায়াত দেননি।

এটা তো তাকদিরের মাসআলা, অনেক বড়দের জন্যই নিষেধাজ্ঞা আছে, সে তো ছোট মেয়ে। সে কী বুঝবে? আমি তার চিন্তাকে পরিবর্তন করতে বললাম। এর দ্বারা তোমার কী লাভ? তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করেছেন। এ কথা শুনে সে কাঁদতে লাগল। আর বলতে লাগল, আব্বু আমার তো মন চায় সকলের পরিবর্তে আমাকে জাহান্নামে জ্বালিয়ে দিক। আর কাউকে না জ্বালাক।

সে তো ছোট বাচ্চা ছিল, অল্প বয়সের কারণে সকলের পরিবর্তে নিজেকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালানোর জন্য প্রস্তুত। কেমন জানি নিজের চোখে জাহান্নামের আগুন অনুভব করছে, আবার মানুষকে আগুন থেকে বাঁচানোর কেমন চিন্তা। এটাই ছিল আমাদের প্রিয় নবীর দরদ, এটাই দাওয়াতের ময়দানের হাতিয়ার। যার ফলে কঠিন দুশমনও দেওয়ানা আর আশেক হয়ে যায়। কুরআনে পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

এই দরদের কথা এই ভাবে বয়ান করেছেন–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতি হবেন। -শুআরা-৩

যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথাকে চাদর বানিয়ে দাওয়াতের ময়দানে কাজ শুরু করে, ঠিক সেই ভাবে বিজয় দেখতে পাবে। সীরাতে পাকের ঘটনাবলীর আমলী নমুনা দেখতে পাবে। ব্যক্তি, জাতি, দেশের বিজয়ে নববী নমুনা দেখতে পাবে। এর পর সামনে আসবে আবুবকর সিদ্দিক (রা.), ওমর ফারুক (রা.), খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), খাব্বাব বিন আরাত রা., মুসআব বিন উমায়ের রা. এর মতো ইসলামের বাহাদুরী। দেখা যাবে হযরত সুমাইয়্যা (রা.), ইয়াসির রা., এবং বেলাল রা., এর নমুনা।

এক ঈমানদিপ্ত ঘটনা

এব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। দিল্লিতে আমার একজন মুসলমান বন্ধু আছে। যিনি বন্ধুত্বের ফী হিসেবে মাসিক টার্গেট বানিয়ে দাওয়াতি কাজের ফিকির করেন। তিনি এক হিন্দু ছেলের উপর দাওয়াতি মেহনত শুরু করেন। দুই তিন দিন তাকে বুঝানোর পর তার বুঝ এসে গেল। সে কালেমা পড়ে মুসলমান হলো। সময়টা ছিল রমজান মাস। ছেলেটির গায়ের রঙ কালো থাকার কারণে বেলাল রা. এর নামের সাথে মিল রেখে তার নাম রাখা হলো বেলাল। আমার বন্ধু তাকে বলল, এখন আপাতত বাড়ির কাউকে বলার দরকার নেই। প্রথমে দ্বীন শেখ এবং বাড়ির লোকদের উপর মেহনত কর। এখন নামাজ রোজা আদায় করার দরকার নেই। সে বলল– কেন? আপনি একদিন নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলাম, দুই একদিনের জন্য নামাজ ছেড়ে দিন অসুবিধা কিসের? আপনি বলেছিলেন, যে নামাজ ছেড়ে দেয় সে মুসলমান থাকে না। আর এখন আপনি নামাজ পড়তে নিষেধ করছেন? আপনি আমাকে বলুন আমি কি দুই নম্বার মুসলমান হবো? যদি দুই নাম্বার মুসলমান হতে হয় তাহলে আমার মুসলমান হয়ে লাভ কি? এ কথা শুনে তিনি বললেন, আগামীকাল থেকে সকাল সকাল ফ্যাক্টরিতে চলে এসো, আর বাড়িতে বলবে, আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ আছে। ইফতারীর পর চলে যাবে, আর এখানেই নামায

পড়ে নিবে। একদিন জাকিরবাগ মসজিদ থেকে জুমার নামায পড়ে বাড়ি ফিরছিল, তার মাথায় টুপি ছিল, তার পিতা এ অবস্থা দেখে খুব রাগান্বিত হলো, তাকে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? সে যৌবনের জোশে বলে ফেলেছে, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। তাকে ধরে বাসায় নিয়ে গেল, অনেক বুঝানোর পরেও কাজ না হওয়ায় তাকে মারতে শুরু করল। একদিন সে কোনো ভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসল। ঐ ছেলের পিতা আমার বন্ধুকে এসে বলল, কালকের মধ্যে ঐ ছেলেকে এনে দিতে হবে। অন্যথায়, পরশু পুলিশের কাছে তোমার ব্যাপারে রিপোর্ট করে দিব। বলব এই মোল্লা সাহেব আমার ছেলেকে জাদু করে তাকে বাড়ি ছাড়া করেছে। এ খবর ওই ছেলে জানতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে সে ফ্যাক্টরিতে এসে বলল, আপনি আমাকে আমার পিতার হাতে তুলে দিয়ে বলবেন, তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। আমি কোনো জিম্মাদারী নিতে পারব না। তিনি বললেন, দেখ এটা সম্ভব নয়, কারণ তারা তো তোমাকে মেরে ফেলবে। সে বলল, না আপনি তাই করুন। আপনার শরীরে একটি আঁচড় লাগুক এটা আমি চাই না। শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু তাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দেয়। তার পিতা তাকে অনেক বুঝানোর পর কোনো কাজে না আসায় খুব মারধর করল। পরিশেষে এলাকার যুবকদের দ্বারা তাকে খুব নির্যাতন করানো হয়। সে এক কথাই বলে তোমরা মুর্তিপূজা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ কর। এ কথা শুনে তারা আরো রেগে ওঠে। আরো নির্যাতন চালায়। সে তার পা দেখিয়ে বলে, তোমরা আমার পা থেকে উপর দিকে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও। সর্ব শেষ উপরে যাবে, যাতে আমি মুখ দিয়ে আমার রবের নাম নিতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার গলা কেটো না। মানুষ নির্যাতন ছেড়ে দিল। তার পরীক্ষা শেষ। আর পথ খুলে গেল।

আপনি একটু চিন্তা করুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের বেলাল রা. আর বর্তমান বেলালের কি সাদৃশ্য। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদি এভাবে দাওয়াত দেয়া হয় তা হলে এমন আরো অনেক নমুনা সামনে আসবে।

এর বিপরীত দাওয়াতের এই মহান কাজ থেকে উদাসিনতার কারণে কত বড় অন্যায় করছি। এক জন ব্যক্তি আমাকে একটি ঘটনা শুনাল। এক শহরে এক ধর্মীয়গুরু আসছে, যিনি বুরহানায় থাকেন। তিনি যখন শহরে

এলেন, তার আসার কারণে শহরকে সুসজ্জিত করা হলো। তার উপর ফুল ছড়ানো হচ্ছিল। পাঞ্জাবের একজন বি,এইচ, পির নেতা একটি মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর করে ফিরছিলেন। তিনি বললেন, দেখুন মানুষ ধর্মের নামে কী উলঙ্গপনা করছে। আর মুসলমানরা ইসলামকে গোপন করে রেখেছে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝে যদি ইসলাম পেশ করা হয় তাহলে এমন কোনো অমুসলিম থাকবে না, যিনি ইসলাম গ্রহণ না করবেন। আসল সত্য ধর্ম তো হলো ইসলামই।

দাওয়াতের ফিকির

মোটকথা, মুসলিম জাতির অধঃপতন, লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার ব্যাপারে যারা চিন্তা-ফিকির করে, তাদের মতে এক মাত্র চিকিৎসা হলো দাওয়াত। এই জাতি দাতা হয়েই সম্মানের স্তর লাভ করতে পারবে। পুরো দুনিয়ার উপর দাপট ও প্রভাব সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পথ নেই। পুরো দুনিয়াকে মুহাম্মাদী পয়গামের মাদউ বানিয়ে নিজের দাওয়াতি দায়িত্ব আদায় করা। কারণ দা'য়ীর সাথে প্রভাব থাকে, এর সাথে শান শওকাতের ফায়সালা করা হয়। এই জাতি যদি দা'য়ী না হয় তাহলে তাদেরকে মাদউ হতে হবে। আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনের বিস্তারকে দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এই সত্য ধর্মকে সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব আমরা যদি দাওয়াতি কাজ না করি তাহলে আমাদেরকে মাদউ হতে হবে। দুনিয়াতে ধর্মত্যাগী হওয়ার একমাত্র কারণ দাওয়াত থেকে উদাসিনতা। আর এই জাতিকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হলো দাওয়াত। এই জন্য প্রচার ছাড়া হেফাজত আর আক্রমণ ছাড়া প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়। তাই দাওয়াতি কাজকে পছন্দ, আর মৌখিক সমর্থন দেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং দাওয়াতি কাজকে পুরো জাতির জন্য জীবনের উদ্দেশ্য বানানো উচিত। কিছু লোককে এই কাজের জন্য পরিপূর্ণ সোপর্দ করে দিতে হবে। আর কিছু লোককে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। উত্তম জাতি হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো দাওয়াত। এ জাতি দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবে। দাওয়াত ছাড়া মানুষের জিকির পরিপূর্ণ হতে পারে না। দাসত্বের হকও আদায় হয় না। সব ময়দানে সফলতার ভেদ হলো এখলাসের সাথে নবীর এত্তেবা। যা দাওয়াতের কাজ ছাড়া অসম্ভব। ভীতু মানুষের জন্যও রয়েছে এর মধ্যে নিরাপদ পথ। আর বীরদের জন্যও রয়েছে পুরো দুনিয়া বিজয়ের পথ।

পরকালের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য জরুরী হলো মানুষ অন্যের হক আদায় করে দিবে। জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এবং আমার নবীর হক আদায় করার জন্য, বিদায় হজ্বের জিম্মাদারী পালন করতে হবে।

দাওয়াতি কাজকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ মনে করতে হবে। জেনে বুঝে এই কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরী এই কাজের সাথে জুড়ে থাকা। এখানে একটি হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে। যা ইবনে সাদ তাবকাতে উল্লেখ করেছেন।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধির থেকে ফিরে এসে, পহেলা মুহাররমে মসজিদে নববীতে সকল সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দিলেন। যেখানে তিনি বলেছেন- "হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা আমাকে পৃথিবীর জন্য রহমত ও পয়গাম্বার বানিয়ে পাঠিয়েছেন। পুরো দুনিয়ার জন্য আমি রাসূল হয়ে এসেছি। আল্লাহর পয়গামকে সারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দিতে চাই। যাতে আল্লাহর হুজ্জত পুরো হয়ে যায়। আল্লাহর পয়গাম থেকে যেন কোনো মানুষ বঞ্চিত না হয়। যাও আল্লাহর উপর ভরসা করে, সারা দুনিয়ার বাদশার কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তোমাদের অস্তিত্বকে ওয়াক্বফ করে দাও। যেই লোকের লেন-দেনের মধ্যে শিরক আছে, তার জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম। তাদেরকে ভালো কাজের নসিহত কর।"

এই বাণী শুনার পরও কোনো মানুষ দাওয়াত থেকে উদাসীন হয়ে থাকে কিভাবে?

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের বড়দের নীতিমালা

এ ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন তোলে, দাওয়াতের কাজ দ্বীনের মধ্যে এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহলে আমাদের আকাবিরদের কাছে এর গুরুত্ব পাওয়া যায় না কেন? এর উত্তর হলো, আকাবিরগণ দাওয়াতি কাজকে গুরুত্ব দেননি, এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ইতিহাস যদি দেখুন তাহলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইসলামের প্রচারের চেষ্টা সবচে বেশী আকাবিরে ওলামায়ে কেরাম করেছেন। বিশেষত সুফি বুযুর্গগণ করেছেন। আপনি যে কোনো এলাকায় যাবেন, দেখবেন এই এলাকার এতো গুলো মানুষ, অমুক বুযুর্গের হাত ধরে মুসলমান হয়েছে। ওই গ্রামের এতো মানুষ, অমুক বুযুর্গের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিছু ওলামায়ে কেরামকে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, ময়দানে সরাসরি অংশ নিতে নাও দেখা

যায়, আসলে দাওয়াতকে সামনে রেখে তারা লোক তৈরি করেছেন। দাওয়াতকে জীবনের মাকসাদ বানিয়ে কাজ করেছেন। এটাই বাস্তবতা। কুরআন হাদিসের এলেন অর্জনকারী ওয়ালামায়ে কেরাম এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে উদাসীন থাকবে এটা কিভাবে সম্ভব?

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। যত বড় বুযুর্গই হোক না কেন, তিনি তো একজন মানুষ। নিষ্পাপ তো আর হতে পারবে না। আমাদের জন্য মাপকাঠি হলো, কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল এবং তার রাসূলের অনুসরণ। এ ছাড়া কোনো ওলি বা কুতুবও যদি এর বিপরীত কিছু করেন, তা আনুগত্যের যোগ্য নয়। "এমন জিনিসের আনুগত্য জায়েয নেই, যার মধ্যে স্রষ্টার নাফরমানী।"

কোনো বড় থেকে বড় মানুষের কোনো কাজ যদি কুরআন সুন্নাহ থেকে পৃথক মনে হয়, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না। তা তার নিজের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এটা তার দুর্বলতাও বলা যেতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করার ব্যাপারে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ব্যক্তির আমল দেখার পরিবর্তে, আমাদের দেখতে হবে কুরআন সুন্নাহ কী বলে।

কুরআন সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত দাওয়াতের এই বিশাল অংশ সম্পর্কে, ওলামায়ে কেরামদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করুন, এর উপর আমল করতে হবে কি না? তাহলে আপনার জন্য পজিটিভ উত্তর আসবে। ওলামা, ফুকাহা, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো একজন আলেমেরও এমন মত নেই যে বলবে দাওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব জাতির উপর ফরজ নয়। ফরজে কেফায়া হওয়ার ব্যাপারে তো কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে কেউ বলেছেন ফরযে কেফায়া। আবার কেউ বলেছেন সাধ্যানুযায়ী ফরযে আইন। হজ্জের মতো। ওলামাদের এমন কোনো মতও নেই যে, এটা শুধু নবীর উপর ওয়াজিব। যেমন তাহাজ্জুদের নামাজ।

আমাদের প্রতিটি কাজ হবে দেহধারী দাওয়াত

এই প্রশ্নের উত্তরের পর, প্রত্যেক উম্মতকে, এই দাওয়াতি মেহনতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে চলতে হবে। আমাদের দৈনন্দিনের সকল কাজ, চাই সেটা লেন-দেন হোক, আর ব্যবসা বাণিজ্য হোক, যাই হোক না কেন, সব কাজকে দাওয়াত বানাতে হবে। ঈমানদারের প্রতিটি কাজ হওয়া উচিত

দাওয়াত। আমাদের দোকান হবে দাওয়াতের দোকান। আমাদের কারখানা হবে দাওয়াতের কারখানা। আমাদের ক্ষেত খামার হবে দাওয়াতের ক্ষেত। আমাদের চাকুরি হবে দাওয়াতের চাকুরি। আমাদের রাজনীতি হবে দাওয়াতের মাধ্যম। আমাদের শোরুম হবে দাওয়াতের শোরুম। মোট কথা, আমাদের ঘর-বাড়ি, আনন্দ-ফুর্তি, সকল অনুষ্ঠানাদি হবে দাওয়াতের অনুষ্ঠান। আমরা নিজেরাই হব দওয়াত। এমন অনেক মানুষ পাবেন যারা মুসলমানের আমল দেখেই মুসলমান হয়ে গেছে। ইসলামের প্রতিটি অঙ্গে রয়েছে এক প্রকার আকর্ষণ। কারণ ইসলাম হলো স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে স্থির হতে পারবে না যতক্ষণ না সে ইসলাম গ্রহণ করবে। এবং সে অনুযায়ী আমল করবে।

সত্যের তৃষ্ণায় প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে। এর পরও শান্তি ও সত্যের খোঁজ পায়নি। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির দিকনির্দেশনা ছাড়া অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। আরিয়া সমাজ, ব্রাহ্মকুমারী, রাম কৃষ্ণ মিশন, রাধা সাওয়ামী, জয় গুরু দেব ইত্যাদি দলগুলো অস্তিত্বে এসেছে, সত্যের তৃষ্ণা আর চাহিদার কারণে। এমন অনেক মানুষের কথা আমার জানা আছে, যারা দিল্লিতে কুলিদের নামাজ দেখে মুসলমান হয়ে গেছে।

আবার জেগে উঠুক ইবরাহিমী ঈমান

দাওয়াতকে উদ্দেশ্য বানিয়ে যদি আমাদের এসলাহ করতে পারি, তাহলে বহু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। তবে শর্ত হলো মানুষের কল্যাণের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে, কল্যাণকে উদ্দেশ্য বানাতে হবে।

এখানে আমি ঐতিহাসিক একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। চিনে আটজন মুসলিম ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে যায়। তাদের মাকসাদ ছিল দাওয়াত। তারা ইসলামি নিয়মে ব্যবসা করেছে। তারা অনেক লাভবান হয়েছে। এদিকে পুরোনো ব্যবসায়ীরা দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা গিয়ে বাদশাকে বলল, এখানে আরব ব্যবসায়ী এসেছে। তারা আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি করছে, তাদেরকে আপনি দেশ থেকে বের করে দিন। তাদেরকে ডাকা হলো। তারা বলল, আমাদের কী অন্যায়? আমরা ক্ষতি করতে আসিনি, আমরা উপকার করতে এসেছি। আপনারাও ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা করুন, আপনারাও লাভবান হবেন। এর কিছুদিন পর তারা আরো

আন্দোলন করতে লাগল, আরব ব্যবসায়ীদেরকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। আবারও তাদেরকে বাদশা ডাকলেন। বললেন আপনারা চলে যান, কারণ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। তারা নিজ সামানাদি গুটিয়ে ফেরার পথে যে সব এলাকায় ব্যবসা করেছিলেন, সে দিক দিয়ে ফিরছিলেন। তারা বললো, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? এই আটজন সব ঘটনা খুলে বলার পর তারা বলল, হয় আপনারা এখানে থাকেন, না হয় আমাদেরকেও নিয়ে যান। জনগণ বাদশার কাছে গিয়ে আবদার জানালেন, তারা যদি চলে যায় আমরাও চলে যাব। এর পর বাদশা তার আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। ইতিহাস সাক্ষী এই আট জনের বদলায় আজ আট কোটি মানুষ মুসলমান। তারা শুধু দাওয়াতকে তাদের মাকসাদ বানিয়ে ছিলেন। আমাদের অন্তরেও যদি অন্যের কল্যাণ নিয়ে, অন্তরে দরদ নিয়ে দাওয়াত দেই তাহলে আমাদেরকে একথা বলার সাহস পাবে না যে, মোল্লারা পাকিস্তান চলে যান। শুধু আমাদের মাকসাদ বানাতে হবে দাওয়াত।

দাওয়াতের পদ্ধতি

দাওয়াতের গুরুত্ব বোঝার পর, এখন প্রয়োজন দাওয়াতের কাজের মধ্যে লেগে যাওয়া। এখন প্রশ্ন হবে দাওয়াতি কাজ কিভাবে করব? এর জন্য তো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। একটি কথা খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে– দাওয়াতি কাজ শিখার চেয়ে বেশী জরুরী হলো তা বুঝা। তার সাথে আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়া। কারো অন্তরে যদি নববী দরদ এসে যায়, তাহলে তাকে সেই মহব্বতই পথ দেখাবে।

কোনো কাজে নিজেকে ন্যস্ত করে দিলে সেই কাজই স্পৃহা সৃষ্টি করে দেয়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। পাঞ্জাবের সনগ্রঁ জেলায় আমার এক বন্ধু মসজিদে নামাজ পড়ায়। তার দুটি ছেলে। দাওয়াতি কাজের জন্য তাদের অন্তরে একটি জ্বলন দেখতে পেলাম। একবার আমি সেখানে সফরে যাই। সময়টা ছিল গরম কাল। দ্বিপ্রহরের সময়, খুব গরম লাগছিল। তারা আমাকে বলল, এখানে পাঁচজন মানুষ আছে, যারা আগে মুসলমান ছিল। এখন তারা শিখ বলে পরিচয় দেয়। আপনি যদি তাদের সাথে একটু কথা বলতেন, হতে পারে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেত। আমরা দুইজন একটি মটর সাইকেলে করে খুঁজে খুঁজে তাদের বাড়িতে গেলাম। আমাদেরকে দেখে খুব সম্মান করল, পরিপাটি বিছানায়

বসতে দিল। সেখানে আমরা বসলাম। সেও ভাবছিল যে, আমাদের ধর্মগুরু এসেছে। তাই সে খুব ইজ্জত করছে। কারী সাহেবের ছেলে আমাকে বলল, আপনি বলেছিলেন একটি সরিষার দানার মতো ঈমানও যদি তাদের থাকে, তাহলে সে কোনো না কোনো দিন জান্নাতে যাবে। এই জন্য আমি আপনাকে এই কষ্ট দিলাম। যাতে সে লোকগুলো চিরস্থায়ী আগুন থেকে বেঁচে যায়। আমার এই যুবকদের দাওয়াতি স্পৃহার প্রতি ঈর্ষা জাগল। তাদের অন্তরে কতটুকু ব্যথা। এটাই মূলত দাওয়াতের বড় হাতিয়ার।

দা'য়ী দাওয়াতের ময়দানে পা রাখার সাথে সাথে, নিজের তরবিয়ত, দাওয়াতের পদ্ধতি ও সব কিছুকে কুরআন ও সীরাতের সাথে জড়িয়ে ফেলতে হবে। এভাবেই মানুষ তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবে।

কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন দুআ

সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলাইহিস সালামের এই মহান কাজের জন্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে নিজেকে কবুল করিয়ে নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দুআয় খুব গুরুত্ব দেয়া। আল্লাহ তাআলা কোনো ধরনের চাওয়া ও আবেদন ছাড়াই আমাদেরকে এই নেয়ামত নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। এর জন্য বেহিসাব শুকরিয়া আদায় করা দরকার। এই মর্যাদার হক আদায় করার জন্য বিশেষ দুআ করা উচিত। আল্লাহ যদি আপনাকে দাওয়াতি কাজের জন্য কবুল করে নেন। তাহলে আল্লাহ নিজেই আপনার যোগ্যতা ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দিবেন। উদাহরণ স্বরূপ, একজন কৃষক, তার ক্ষেতে কাজ করার জন্য একজন দিনমজুর নির্বাচন করল। সেই ক্ষেতের প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি সেই কৃষক নিজেই ব্যবস্থা করে দিবেন। ক্ষেতে ধান লাগানোর জন্য পানি কোথা থেকে আসবে? সার কোথা থেকে আসবে? সবকিছু মালিকই ব্যবস্থা করেন।

এমনি ভাবে কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে দাওয়াতি কাজের জন্য কবুল হয়ে যায়, তাহলে তার যোগ্যতা ও প্রয়োজনাদী সব কিছু তিনিই ব্যবস্থা করে দিবেন। বয়ানে প্রভাব সৃষ্টি হওয়া, লিখনিতে প্রতিক্রিয়া হওয়া, আলোচনার পদ্ধতি, মাওয়ায়েজে হাসানা, উত্তম পন্থায় বিতর্ক ইত্যাদি। সব কিছু তিনিই ব্যবস্থা করে দিবেন। একই সাথে ঈমানী মজবুতি ও আধ্যাত্মিকতা ও মারেফাত অর্জন হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَه□ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَه□ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِه□ مِنْ وَالٍ

অর্থ: তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোনো জাতির ওপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।-সুরা রাআদ ১১

এইজন্য দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতার জন্য দুআর খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত।

দা'য়ীর প্রশিক্ষণ

দা'য়ী নিজের প্রশিক্ষণের ফিকির করবে। শুধু মৌখিক দাওয়াতেই প্রভাবিত হবে না। এর সাথে থাকতে হবে আমলের শক্তি। এক্ষেত্রে দা'য়ীকে কুরআন ও সীরাতের শরণাপন্ন হতে হবে। তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ উভয় দিক সীরাতের নমুনা বানাতে হবে। এইক্ষেত্রে কয়েকটি কথা খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। একজন সাধারণ মানুষও যদি সীমিত ভাবে সীরাতের অধ্যয়ন করে, তাহলে সেও একথা অনুভব করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। -সুরা ক্বলাম-৪

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি স্বভাবের কথা সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। বিশেষ করে দুটি গুণ, তা হলো, সততা আর আমানত। এই গুণ দুটি এমন ভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ হয়ে ছিল, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের পরিবর্তে সেই গুণ হিসেবে, সাদিকুল আমিন বলে ডাকতো। কাবাঘর নির্মাণের সময়, হাজরে আসওয়াদ উঠানো নিয়ে সে সিদ্ধান্ত হলো, পর দিন সকালে যখন লোকজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্ব প্রথম দেখল, সকলেই বলে উঠলো, আমানতদার সত্যবাদী এসে গেছেন। আমরা তার উপর সন্তুষ্ট।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর এই দুইটি গুণের ভিতর অনেক হেকমত লুকিয়ে ছিল। সততা আর আমানতদারী যার মধ্যে থাকে সে কঠিন থেকে কঠিন হৃদয়ের মধ্যেও ঠাঁই করে নিতে পারে। তার কথা খুব গুরুত্বের সাথে মানে ও শুনে। এই জন্য সীরাতে নববীর আনুগত্য প্রত্যেক দা'য়ীর জন্য খুবই জরুরী। সেই গুণগুলো নিজের মধ্যে ফিট করতে হবে। যা নবীজীর মধ্যে ছিল। এ ছাড়া দাওয়াতের মধ্যে কোনো প্রভাব সৃষ্টি হবে না।

সততার ব্যাপারে মৌখিক সততার সাথে সাথে ওয়াদা পূরণের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কথা কাজে মিল থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর এক মুরিদের ঘটনা বর্ণনা করছি।

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর এক মুরিদ সাহারানপুরে থাকতেন। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খাদেমগণ হাকিম আনার পরামর্শ করছেন। তিনি বললেন, আমি মুখাপেক্ষি, তাই আমাকে যেতে হবে। তিনি পায়ে হেঁটে চললেন, বেশী দুর্বলতার কারণে সাথে একটি চেয়ার নিয়ে নিলেন। কিছুদূর হেঁটে যান আর কিছু সময় চেয়ারে বসে বিশ্রাম করেন। এভাবে হাকিম সাহেবের বাড়িতে পৌঁছলেন। হাকিম ছিল বেদাতি। তাই সে সালাতে গাওছিয়া পড়ছিল। এই অবস্থা দেখে চিকিৎসা না করিয়েই বাড়িতে ফিরলেন। খাদেম জিজ্ঞাসা করল– হযরত! আপনিতো তার কাছ থেকে দ্বীনি কিছু নেয়ার জন্য যান নি? তিনি বললেন, আমি প্রতিদিন বেতেরের নামাযে কোন মুখ দিয়ে এ কথা বলব "ওয়া নাতরুকু মাইয়াফজুরুকা" যারা আপনার নাফরমানী করে তাদেরকে ছেড়ে দিব। মোট কথা সর্বপ্রকার সততাকে নিজের আমলের মধ্যে পেশ করতে হবে।

সততা আর আমানতদারী ছাড়াও অন্যের কল্যাণকামিতা ইত্যাদি অনেক গুণাবলী সীরাতের অধ্যয়নের মাধ্যমে শিখতে পারবে। যে গুলো দা'য়ীর জন্য খুবই জরুরী। কঠিন অবস্থাতেও দুশমনদের জন্য দুআ ও তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এটা প্রত্যেক দা'য়ীর মাঝে থাকা উচিত।

দাওয়াতের পথে মন পরিষ্কার হওয়া জরুরী

নিজের আখলাক চরিত্রকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী তৈরি করবে। এ জন্য সীরাতে পাকের একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে ভালো করে চিন্তা করা উচিত। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সূরা আলাম নাশরাহ,-এর তাফসিরে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যে কোনো জিনিস জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, যা অন্য কেউ পারতেন না। একবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবুওয়াতের ব্যাপারে আপনি সর্বপ্রথম কী দেখেছেন? তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন– আবু হুরায়রা! আমার বয়স যখন দশ বছর কয়েক মাস। আমি মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আসমানের দিক থেকে একটি আওয়াজ এল। একজন অপরজনকে বলছে, ইনিই কি উনি? অপর জন বললেন, হ্যাঁ। এবার দু'জন ব্যক্তি আমার কাছে এলেন। যাদের মুখ এতো নূরান্বিত ছিল, যা আমি এর পুর্বে কখনো দেখিনি। তাদের থেকে এমন সুগন্ধ আসছিল, যা আমি কোনো দিন পাইনি। তারা এমন কাপড় পরে এসেছে, যা কোনো দিন কাউকে পরতে দেখিনি। তারা এসে আমার বাহু ধরলেন। এমন ভাবে ধরলেন আমি বুঝতেও পারলাম না। একজন অপরজনকে বলছেন তাঁকে শুইয়ে দাও। আমাকে শুইয়ে দেয়া হলো। কিন্তু আমি এতে অনুভবও করতে পারলাম না। আমার কোনো প্রকারের কষ্টও হলো না। এরপর একজন অপরজনকে বলল, তার বুকটি ফাঁক কর। তারা আমার বুক চিরলো, আমার কোনো ব্যথা লাগল না। কোনো রক্তও বের হলো না। একজন বললেন, তার মধ্য থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা বের করে দাও। তাই একজন রক্তের টুকরার মতো কি যেন বের করে নিক্ষেপ করল। এর পর একজন বলল, তার মধ্যে মহব্বত, রহমত, দয়া ভরে দাও। এর পর একটি পয়সার মতো কী যেন আমার বুকের মধ্যে রেখে দিলেন। এবার আমার ডান পায়ের আঙ্গুলকে হেলিয়ে বললেন যাও শান্তি ও নিরাপদে থাক। এর পর আমি ছোটদের দেখলে তাদের প্রতি ভালোবাসা আগের চেয়ে বেশী দেখতে।

কেমন যেন রেসালতের সর্ব প্রথম নেয়ামত ছিল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে খুলে দেয়া। পরে উনার অন্তরে অন্যের ব্যাপারে ভালোবাসা ও রহমত ছিল বেশী। তাঁর অন্তর থেকে হিংসা, বিদ্বেষ বের করে ফেলা হয়েছে। ফলে তাঁর পুরো সত্তাই মাথা থেকে পা পর্যন্ত রহমতে পরিণত হয়ে ছিল।

যে ব্যক্তি জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে আদর্শ বানিয়ে ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করতে চায়, তার জন্য জরুরী, সে যেন মহান সম্পদ অর্জন করার ফিকির করবে। নিজ রবের কাছে অন্তর খুলে দেয়ার দুআ করবে। কারণ যে যত চেষ্টা করবে, সে তা পেয়ে যাবে। এটা নবীর

সুন্নাত। নিষ্ঠার সাথে নবীর আনুগত্য করবে। তাহলে আল্লাহ অন্তর খুলে দিবেন।

ইতিবাচক ফিকির অন্তর খোলার একটি লাভ

অন্তর খুলে যাওয়ার মতো এই সম্পদ অর্জনের একটি লাভ হলো, দা'য়ীর চিন্তা ফিকির সব কিছু নবীর মতো ইতিবাচক হয়ে যায়। সর্বপ্রকার খারাপ চিন্তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত অধ্যয়ন করে দেখুন। সেখানে ইতিবাচক দিক ছাড়া আর কিছু আপনার চোখে ধরা পড়বে না। দেখতে পাবেন সর্বোচ্চ দয়া, ভালোবাসা, অন্যের জন্য কল্যাণকামিতার অপূর্ব নিদর্শন। অন্যের দোষ বর্ণনা তো দূরের কথা, তা শ্রবণও করতেন না। তাঁর শত্রুদের জন্যও ছিলেন খুব খায়রখাহি। কল্যাণকামী।

মক্কী জীবনের জানের দুশমনদের জন্য সারা রাত কান্না করতেন। আর দিন ভর তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের দ্বারে দ্বারে ঘোরাফিরা করতেন। তাকে ধিক্কার দিতো। তাড়িয়ে দিতো। এর পরও তাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেন। কখনো নিরাশ হতেন না। এর মূল কারণ ছিল, তার ইতিবাচক চিন্তা। যা তাঁর সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। তায়েফের ময়দানে তিনি পাথর খেয়েছেন। কঠিনভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। সব কিছু সহ্য করেছেন। এমন সময় জিব্রাইল আমিন (আ.) শাস্তির ফেরেস্তাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি তাদের থেকে নিরাশ হননি। সেখানেও কল্যাণ দেখেছেন, বললেন– তারা হয়তো মুসলমান হয়নি। তাদের প্রজন্মে এমন লোক আসবে, যারা মুসলমান হবে। যারা আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে। তার ইবাদতগুজার হবে।

উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের পক্ষ থেকে খুবই কষ্ট পেয়েছেন। সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাঁত মুবারক শহীদ করেছেন। নিজে মাথায় চরম আঘাত পেয়েছেন। মাথা মুবারক ফেটে গেছে। এমন সময় কিছু সাহাবায়ে কেরাম উনার কাছে উপস্থিত হলেন। আবেদন করলেন, আপনিতো আল্লাহর নবী। তাদের জন্য বদ দুআ করুন। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, " আমাকে অভিশাপকারী বানানো হয়নি। বরং আমাকে দা'য়ী ও রহমত বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। "

এর পর সেই জালিমদের কল্যাণ চেয়ে, পুরো দুনিয়ার মমতা আর রহমত উৎলিয়ে এলো। খেয়াল হলো, হায় আমার সাথে অত্যাচার করার কারণে যদি তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আসমানের দিকে হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন। "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়াত দিয়ে দিন, তারা বুঝে না।"

জুলুম আর বর্বরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল। নিজ মাতৃভূমি মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। আবার মদিনায় এসে যুদ্ধ করছে। নির্যাতন করছে। এমন সময় তাদের জন্য কল্যাণের আশা করছেন। এটা আমার নবীর ইতিবাচক চিন্তার বহিঃ প্রকাশ। এটাই আমার নবীর চরিত্র।

এই উহুদ যুদ্ধে নবীর প্রিয় চাচা, সাইয়্যিদুশ্ শুহাদা হামজা রা.-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে। ওয়াহশি সে সময় হিন্দার গোলাম ছিলো। আর সে ছিলো ইসলামের কঠিন দুশমন। সে হযরত হামজা রা . এর নাক, কান কেটে, বুক চিরে কলিজা চিবিয়ে খেয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় তাঁর চাচার চিন্তায় এতো পরিমাণ চিন্তিত ছিলেন তাঁর চাচার কথা মনে পড়লে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। সেই শাহাদাতের প্রভাব এমন ছিল, ওয়াহশি (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর তাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সামনে বসবে না। তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা মনে পড়ে যায়। আমার মনে কষ্ট লাগে। হতে পারে এর জন্য তোমার দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জন্য ওয়াহশি রা. সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসতেন। সামনে বসতেন না।

এটাই ছিল নবীয়ে রহমতের ইতিবাচক চিন্তার ফল। মক্কা বিজয়ের পরও তিনি ওয়াহশির কাছে সাহাবাদের দিয়ে দাওয়াত পাঠিয়েছেন। যিনি প্রিয় চাচাকে শহীদ করেছে তার কাছে দাওয়াত।

হযরত ওয়াহশির কাছে ইসলামের দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হরবের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য লোক পাঠালেন। হযরত ওয়াহশী উত্তরে বার্তা পাঠালেন যে, আপনি আমাকে কেমন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন? বরং আপনিই তো বলেছেন হত্যাকারী, মুশরিক, ব্যাভিচারী জাহান্নামে যাবে। আর কেয়ামতের দিন তাদের উপর দ্বিগুণ শাস্তি হবে।

চিরদিন লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে জ্বলবে। আমি তো এসবই করেছি। এর থেকে কি বাঁচার কোনো উপায় আছে? সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।-ফুরকান- ৭০

এই আয়াত শুনে হযরত ওয়াহশী বললেন, তওবা, ঈমান, সৎকাজ এসব আমার জন্য কঠিন, তা আমি করতে পারব না। এর পর আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিু পর্যায়ের পাপ, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।-নিসা-৪৮

এরপর ওয়াহশী বললেন, ক্ষমা তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। জানি না আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি না। এছাড়া কি আরো কোনো সুযোগ আছে? এর পর আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।-যুমর -৫৩

হযরত ওয়াহশী বললেন, এবার ঠিক আছে, আমি মুসলমান হবো। এবার লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরাও তো এই পাপ করেছি। যা ওয়াহশি করেছেন। এই আয়াত কি আমাদের জন্যও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ এটা সকল মুসলমানদের জন্য।

প্রত্যেকের জন্য কল্যাণ কামনা, শেষ সময় পর্যন্ত অন্যের কল্যাণের আশা করা, নবীজীর একটি মৌলিক দিক। যা উপেক্ষা করে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। জাতিও বড় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মক্কা বিজয়ের সময় দুশমনদের উপর বিজয় দান করেছেন। এই সময়টা ছিল প্রতিদান নেয়ার সময়। জালিমদের ভর্ৎসনা করার সময়। লাঞ্ছিত করার সময়। এসব কিছুর পরিবর্তে তারা রহমতের ধ্বনি লাগিয়ে ছিল। সাহাবায়ে কেরাম ধ্বনি উঠালেন আজকের দিন প্রতিদানের দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরে বললেন– না আজকের দিন রহমতের দিন। এই ধ্বনি ছিল ইতিবাচক চিন্তায় মগ্ন থাকার প্রতিফল।

যারা নিজের জীবনকে সীরাতের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করতে চায়, তার জন্য উচিত সে যেন এই ইতিবাচক ফিকির তার মধ্যে সৃষ্টি করে। সব স্থানে অন্যের জন্য কল্যাণ চাওয়ার তৌফিক দান করুন।

জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) শুনলেন এক চোর বার বার শাস্তি পাওয়ার পরও চুরি করেছে। ফলে আজ তার ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। তিনিও তা দেখতে গেলেন। গিয়ে তিনি আকস্মিক চোরের পায়ে চুমু খেতে লাগলেন। মানুষ আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি বললেন আমি চোরকে চুমু দেইনি। তার দৃঢ়তা এস্তেকামাতকে চুমু দিয়েছি। এই অবস্থাতেও তিনি একটি ভালো দিক বের করে নিয়েছেন।

তুমি কি ভাবছ যে ফুলের মাঝে কাঁটা

নাওয়াজ দেওবন্দী হলেন একজন ভালো উর্দূ কবি। আমার খুব কাছের বন্ধু। দেওবন্দের এক স্থানে আমার প্রোগ্রাম ছিল। আমার উপস্থিতির কথা শুনে তিনি আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈর্ষণীয় একজন প্রেমিক মনে করি। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের একটি দোকান অনেক বেশী মূল্যে ভাড়া নিয়েছেন। সেই দোকানে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি দেওবন্দের তুলনায় এত দামী দোকান ভাড়া নিলেন কেন? তিনি বললেন, নিসবত একটি বড় জিনিস। আমিতো দারুল উলূমের উস্তাদও হতে পারলাম না, ছাত্রও তো হতে পারলাম না। কমপক্ষে দারুল উলূমের ভাড়ার নিসবত যেন অর্জন হয়ে যায়। দারুল উলূমের এক শিক্ষক সেখানে বসে ছিলেন, যিনি মাদরাসা প্রশাসনের উপর বেশী সন্তুষ্ট

ছিলেন না। তিনি বললেন দারুল উলূমকে তো ভূত বানিয়ে ফেলছে। সেখানে আর কী রাখবে। এমন আরো কিছু কথা বললেন। নাওয়াজ সাহেব বললেন, আমি গত কাল মাগরিবের সময় মসজিদে রাশীদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যখন মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিলেন। ছাত্রদের ব্যাট, জাল রেখে সেই ময়লা কাপড়ে মসজিদের দিকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। মনে হলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাথে তাদের সম্পর্ক নেই।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এল, যদি দারুল উলূমের কোনো ছাত্র নিজ প্রয়োজনেও সিনেমা হলের সামনে দিয়ে যায়, তাহলে আর রেহাই নেই। এমনকি মুসলমানরাও তাদের পত্রিকায় ছাপিয়ে দিবে। কিন্তু নামাযের জজবার এই দৃশ্য তাদের চোখে পড়বে না। তখন আমি একটি কবিতা বললাম।

তুমি কি ভাবছ যে, ফুলের সাথে কাঁটা।
আমার তো খুশি হয় যে, কাঁটার সাথে ফুল।

এটাই হলো ইতিবাচক আর নেতিবাচক চিন্তার পার্থক্য। এক গণ্ডাসের মধ্যে অর্ধেক পানি। কেউ এসে বলে অর্ধেক গণ্ডাস পানি। আবার কেউ বলে অর্ধেক গণ্ডাস খালি। দুজনের কথাই সঠিক। কিন্তু মানসিকতার বা চিন্তার পার্থক্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিবাচক দিককেই দেখতেন। এটাই সীরাত অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ইতিবাচক নীতি থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে সব স্থানে শুধু অন্যের খারাবিই চোখে পড়ে। সব জায়গায় শুধু বিপদই মনে করা হয়। কারো ভালো দিক খোঁজা এবং ভালো ভাবে তাকে স্মরণ করা, এই মানসিকতা তো হারিয়েই গেছে। সাধারণ দ্বীনি পরিবেশেরও একই অবস্থা হয়ে গেছে। কারো যদি হাজারো ভালো দিক থাকে, আর একটি দিক থাকে খারাপ, তাহলে সেই খারাপ দিককে কেন্দ্র করে আলোচনা হবে। তার ভালো জিনিস গুলোকে স্বীকার করার তো প্রশ্নেই আসে না। কারো ব্যাপারে যদি কোনো খারাপ ধারণাও করার সুযোগ থাকে, শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে পুরো দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেয়া আমাদের জিম্মাদারী মনে করি। মনে হয় তার প্রচার আমাদের উপর ফরজ হয়ে গেছে।

নিজের দোষের উপর ধারণা করে, অন্যের উপরও সেই দোষগুলো খুঁজতে শুরু করি। এটা আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কারো দোষ বলতে দেখলে তিনি নিষেধ করতেন। বলতেন, আমি অন্যের দোষ জানতে চাই না। আমাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, অন্যের দোষ চর্চা আমাদের চাকুরি হয়ে গেছে।

একবার দারুল উলূমের কিছু ওলামায়ে কেরাম আমাদের ফুলাতে এলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন– আপনারাতো ওলামায়ে কেরাম, আমি একটি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করতে চাই। একজন বললেন, কী মাসআলা? লোকটি বললেন, বর্তমান যুগে কিছু দ্বীনদার মানুষ একত্রে কিছু সময় বসা জায়েজ হবে কি? মুফতি জফিরউদ্দী সাহেব বললেন– কারণ কী? না জায়েয হবে কেন? সেই লোক বললেন– কিছু মানুষ একত্রিত হলে, তারা গীবত আর অন্যের দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়ে যায়। মুফতি সাহেব বললেন- আপনি তো ঠিকই বলেছেন। কত দুঃখজনক আমাদের অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আলোচনার সময় এমন ঘটনা কল্পনাও কি করা যায়?

নবীজীর আনুগত্যের দাবি ঃ একটি পর্যালোচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের মৌখিক দাবিদার আর কিছু নয়। মানুষ এই মহান অধ্যায় থেকে বঞ্চিত। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, লেন-দেন, আকিদা-বিশ্বাস জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে পৃথক বরং তার উল্টো। ঐসব জিনিস যা আমরা দুনিয়াদারী মনে করি। যেমন ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-সাদি, সুখ-দঃখ, চলা-ফেরা ইত্যাদি বিষয়ে তো নবীর আনুগত্য প্রয়োজনই মনে করি না। কিন্তু যে সব কাজকে আমরা দ্বীন মনে করি সেগুলোও যদি একটু সীরাতের আয়নায় দেখি, তাহলে দেখব এটাও আমাদের ভিন্ন জগৎ। উদাহরণস্বরূপ আমরা আমাদের মসজিদ গুলোকে মসজিদে নববীর সাথে তুলনা করি। তাহলে দেখব মসজিদে নববী ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল। ইসলামি আদালত, ইসলামি পার্লামেন্ট ছিল। সেটাই ছিল আবার জেল খানা ও সেনাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানেই ছিল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সব কিছুর মূল কেন্দ্র। নফল ও ব্যক্তিগত ইবাদতের কেন্দ্র ছিল ঘর। তাই তো মসজিদে নববীর ফরমান ছিল "তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবরস্থানে পরিণত করো না। এর উদ্দেশ্য ছিল জামাত ছাড়া ব্যক্তিগত কাজের মারকাজ বানাও বাড়িকে। আর

মসজিদকে জাতীয় ও দাওয়াতের কাজের জন্য ছেড়ে দাও।

সে সময় সরকারি বেসরকারি সব কাজের জন্য মানুষকে মসজিদে যেতে হতো। মানুষকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক করে কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে না। দুনিয়া তো হলো আল্লাহকে ভুলে গিয়ে গাইরুল্লাহর জন্য কোনো কাজ করা। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি কোনো মানুষ কোনো কিছু করতে পারত? নির্দেশ ছিল মসজিদে পবিত্র অবস্থায় এসো। যেই মুসলমানকে বার বার মসজিদে যেতে হতো সে কি অপবিত্র অবস্থায় থাকতে পারতো?

এর বিপরীত যত বড় এজতেমায়ী মাসওয়ারই হোক না কেন আমরা মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে নফল পড়াকে মসজিদের হক আদায় করা মনে করছি। যেখানে সকল দ্বীনি কাজের কেন্দ্র হলো মসজিদ, সেই মসজিদকে মসজিদে নববীর মতো বানাতে পারলাম না। তা হলে অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে আমাদের কী অবস্থা হবে। এতেই বুঝা যায়– নবীর আনুগত্যকে ছেড়ে অন্যের অকল্যাণ ও বেরহমী, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই।

সীরাতে পাকের আনুগত্য করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ

আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।-যুমার ২২

আলোর মধ্যে মানুষ নিজেকে স্বাধীন ও মুক্ত মনে করে। আর খুব স্বাধীনতার সাথে চলতে পারে। আর অন্ধকারে থাকে সব প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা। সব জায়গায় বাধা অনুভূত হয়। এমনি আমাদের অন্তরের সংকির্ণতার কারণে আমাদের শক্তি ও আমলের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আমাদের উপর নৈরাশ্য ছেয়ে গেছে। আজ যদি আমাদের খোলা অন্তরের সম্পদ অর্জন হয় তাহলে আমাদের চিন্তা-ফিকির নববী চিন্তা-ফিকিরে পরিণত হবে। সকল পথ মনে হবে খোলা। দাওয়াত ও জীবনের সব ময়দানে আমরা আগে বাড়ার স্পৃহা পাব। নিজের বন্ধু বান্ধব, ও সমমনা ব্যক্তিদের সাথে ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে তো আমরা বাধ্য।

দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে দয়া করা এবং ভালোবাসা, ছোটদের উপরে দয়া এবং বড়দের জন্য ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা এছাড়া মুসলমান দাবি করতে পারবে না।

দা'য়ীর দুটি গুণ

খুব অল্প সময়ে মাত্র ২৩ বছরের সময়ে নবীর পয়গামকে সারা দুনিয়াতে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতি মিশনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

এক : কোনো ধরনের লোভ ছাড়া, মানুষের কল্যাণকামিতা ও ভালো চাওয়া।

দ্বিতীয় : অন্যের তুলনায় ব্যক্তিগত আমলকে আগে রাখা। উদাহরণস্বরূপ তিনি উম্মতকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দাওয়াত দিয়েছেন। তার আগে তিনি বেশী বেশী নামাজ পড়েছেন। অন্যকে রোজা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি এক মাস রোজা ছাড়াও মাসে তিন দিন, সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। অন্যকে যাকাত দেয়ার দাওয়াত দিতেন, আর নিজের বাড়িতে একটি আশরাফি থাকলে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে দান করে শেষ না করবেন, ততক্ষণ তিনি স্বস্তিলাভ করতে পারতেন না। অন্যের জন্য যেটা সহজ করতেন নিজের জন্য রাখতেন কঠিন। দা'য়ীকে তার দাওয়াতের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য এসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। বাহির থেকে বেশী নিজের ভেতর খেয়াল রাখতে হবে। দা'য়ীর চরিত্রে যদি আমল না থাকে তাহলে তার দাওয়াতে প্রভাব থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাওয়াত পয়গামের সততার জন্য নিজের কৃতিত্ব পেশ করেছেন।

দা'য়ী নিজের কাজে এ ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। এটাও সত্য যে, কখনো যদি কেউ অন্য কাউকে দাওয়াত দেয় তাহলে সেই আমল তার মধ্যে চলে আসে। দাওয়াত দেয়ার সময় এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, আমি যেই জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি সেটা যেন আমার ভিতর চলে আসে। এভাবে দাওয়াতকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করবে।

দাওয়াতি সাফল্যের সহজ পথ

এটাই বাস্তবতা, যা হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন- দাওয়াতের হুকুম তো (মানসুস) নির্দিষ্ট। কিন্তু তার

পদ্ধতি নির্দিষ্ট নয়। এই পদ্ধতি দা'য়ীর অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। একটু গভীরতার সাথে সীরাত মুতালা করলে, মানুষের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে তা দা'য়ীর জেহেনে চলে আসবে। এই জন্য কাজ শুরু করার জন্য কিছু লোককে টার্গেট বানাতে হবে। সে অনুযায়ী কাজ শুরু করতে হবে। এই কাজই তাকে চূড়ান্তে পৌঁছে দেবে। শুরুর দিকে ঈমান ওয়ালা মানুষ দা'য়ীর সমাজে কম থাকলেও এই কাজে সাড়া দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মান ও ওয়াকার দিয়ে দেন। কুরআনে কারিমে হযরত নুহ (আ.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ

অর্থ: তখন তার কওমের কাফের প্রধানরা বলল- আমরা তো আপনাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের ওপর আপনাদের কোনো প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি।-হুদ-২৭

হযরত মুসা (আ.)-এর ব্যাপারে একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَمَا أَمَنَ لِمُوْسٰى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ

অর্থ: আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তার কওমের কতিপয় বালক ছাড়া- ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোনো বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল।-ইউনুস-৮৩

দাওয়াতে বড় লোকদের তুলনায় গরিবরা সহজে সাড়া দেয়। এই ব্যাপারে আমার এক স্নেহভাজন বলেছেন, ক্যান্সার হসপিটালে যদি কাজ শুরু করা যায়, তাহলে সেখানে কাজের সুযোগ বেশী। তাই দাওয়াতের কাজে সমাজের দুর্বল লোকদের দিয়ে কাজ শুরু করা। কিছু লোককে

টার্গেট বানিয়ে দুআ শুরু করা। টার্গেট বানিয়ে দুআ করা আমাদের নবীজীর বড় একটি সুন্নাত। যা আজকাল বিশেষ লোকদের থেকেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে একটি হাদিস আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "ফেতনা-ফাসাদের যুগে যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করবে তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব দান করা হবে।"

দুআর আরেকটি লাভ হলো, দা'য়ী যখন বার বার এই দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচান। চিরস্থায়ী আগুন থেকে তাকে বের করে দিন। তখন তার মনে মাদউর ব্যাপারে ব্যথা সৃষ্টি হবে, আর সেই ব্যথা মাদউর উপর খুবই প্রভাব পড়বে। বার বার এই দুআ করার কারণে, নিজ ব্যক্তিত্ব থেকে দৃষ্টি সরে আল্লাহর উপর আস্থা সৃষ্টি হবে। আমাদের একটি বড় ভুল ধারণা হলো, আমার তো অনেক যোগ্যতা আছে। আমি এই কাজ করে ফেলব। এটা হলো অহংকার। এছাড়া এ কথা যেহেনে থাকতে হবে যে, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দা'য়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে এই এরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

অর্থ: আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।-সূরা কাসাস-৫৬

কখনো এমন হীনম্মন্যতার শিকার হয় যে, এই কাজের জন্য তো অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন। আমি এই মহান কাজটি কিভাবে আঞ্জাম দিব। যখন সে এই মনে করে দুআ করবে- হেদায়াতের মালিক তো হলেন আল্লাহ। তাহলে নিজের সত্তার উপর কোনো ভরসা থাকবে না। হীনম্মন্যতার শিকারও হবে না। এই চিন্তা থাকলে দা'য়ী বড় বড় মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে।

দু'আর একটি বড় উপকার হলো, কোন্ মাদউকে কীভাবে দাওয়াত দিতে হবে, এর কী পদ্ধতি হবে, তা আল্লাহ নিজেই দা'য়ীর অন্তরে ঢেলে দেন। কয়েক দিন দুআ করার পর মাদউর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এরপর কেনো এক সুযোগে পরিষ্কার দাওয়াত দিতে হবে। যদি গ্রহণ করে তো ঠিক আছে। অন্যথায় নিরাশ হবে না। ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ কথা মনে রাখবে যে, এই লোকটিকে কুফর থেকে বাঁচাতে হবে। এটা

ভাবা যাবে না যে, তার কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিবো। তাকে কুফর থেকে বাঁচানোকে মাকসাদ বানাবে। ইনশাআল্লাহ বিজয় অর্জন হবে।

এ ব্যাপারে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে– এক লক্ষ মানুষও যদি বলে– হ্যাঁ ইসলাম সত্য ধর্ম। সুন্দর ধর্ম। বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম, ইত্যাদি। এর চেয়ে অনেক ভালো, একজন প্রতিবন্ধী লোককে কালেমা পড়ানো। যে কোনো ভাবে মানুষকে কুফর আর শিরক থেকে বাঁচানোর বিষয়টি মাকসাদ বানাতে হবে। হেকমত আর সতর্কতার কারণে স্পষ্ট দাওয়াত দেয়া হয় না। শুধু ইসলামের সাথে পরিচয় করানোর ফিকিরে সীমাবদ্ধ থেকে যাই। শুধু ভুল ধারণা দূর করেই শেষ করে দেয়া হয়।

সীরাত পাঠের একজন ণ্যূনতম পাঠকও জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লিখিত দাওয়াতের মধ্যে শুধু এতটুকুই থাকতো– "মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপদে থাকবে।" আর মৌখিক দাওয়াতের শব্দটিও এমন হতো "তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়, বিজয়ী হয়ে যাবে।" এছাড়া অন্য কোনো বাক্য পাওয়া যায় না।

বাস্তবতা এই, দা'য়ীর মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, ওই লোকটি ইসলাম গ্রহণ না করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। মৃত্যুর এক মুহূর্ত গ্যারান্টি নেই। তাকে আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। তাহলে সে আর হেকমত আর সুযোগের কথা চিন্তা করবে না। সে অনিচ্ছায় চিৎকার করে উঠবে, বাঁচো ! আগুন থেকে বাঁচো!!

মনে করুন আপনার প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লেগেছে। সেই বাড়ির কর্তা আপনার দুশমন। এখন আওয়াজ শুনছেন, আগুন! আগুন!! এমতোবস্থায় আপনি কী করবেন? আপনি কি মনে করবেন সে তো আমার দুশমন, যার বাড়িতে আমি আগুন নিভাতে জাচ্ছি, সে কি আমার পানি গ্রহণ করবে? কী যেন মনে করে? খারাপ তো ভাববে না? তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব একজন মানুষ চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে আর আমি তাকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য একটু ফিকিরও করছি না।

দা'য়ীর জন্য জরুরি যে, অমুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা। আমরা মনে করি যে, ইসলামের বিরোধীদের উত্তর দেয়ার জন্য খুব প্রস্তুতি নিতে হয়। এটা বাস্তব যে, সাধারণত যারা ইসলাম গ্রহণ করতে আসে, তাদের ইসলাম বিরোধী কোনো প্রশ্নই থাকে না।

আল্লাহ যাকে হেদায়াত দিতে চান, দা'য়ীর ফিকিরের প্রতিফল যার উপর হবে তার সকল প্রশ্ন আপনা আপনিই শেষ হয়ে যায়। তাই দা'য়ীর

জন্য জরুরি যে, দা'য়ী তার রুহানী ও আত্মিক শক্তিকে মজবুত করার চেষ্টা করবে। কারণ এই ঈমানী রুহানী শক্তি আশ্চর্যজনক প্রভাব রাখে।

কবির ভাষায়–

'প্রভাত খুবই কাছে আল্লাহর নাম নাও হে সাকি'

এখন সময় খুবই অনুকূল। শুধু ইচ্ছার প্রয়োজন। পুরো দুনিয়া সত্যের পিপাসায় তৃষ্ণার্ত। খুবই অস্থিরতার সাথে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন কে আছে যে, তাদের এই তৃষ্ণার্ত অন্তরকে ইসলামের পথ দেখাবে। এবং তাদেরকে মানবতার সম্মানিত স্থান দান করবে। হায়! আমাদের যদি এই দিকে ভ্রূক্ষেপ বা আগ্রহ থাকতো। আর পুরো জাতি যদি তাদের দাওয়াতি জিম্মাদারী আদায় করাকে সৌভাগ্য মনে করতো।

সমাপ্ত